# আস্ সা-ফ্‌ফা-ত

## ৩৭

### নামকরণ

প্রথম আয়াতের والصافات শব্দ থেকে সূরার নাম গৃহীত হয়েছে।

### নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বিষয়বস্তু ও বক্তব্য উপস্থাপনা পদ্ধতি থেকে মনে হয়, এ সূরাটি সম্ভবত মক্কী যুগের মাঝামাঝি সময়ে বরং সম্ভবত ঐ মধ্য যুগেরও শেষের দিকে নাযিল হয়। বর্ণনাভংগী থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, পশ্চাতভূমিতে বিরোধিতা চলছে প্রচণ্ড ধারায় এবং নবী ও তাঁর সাহাবীগণ অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছেন।

### বিষয়বস্তু ও বক্তব্য বিষয়

সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাওহীদ ও আখেরাতের দাওয়াতের জবাব দেয়া হচ্ছিল নিকৃষ্ট ধরনের রঙ–তামাসা ও ঠাট্টা–বিদ্রূপের মাধ্যমে। তাঁর রিসালাতের দাবী জোরে–শোরে অস্বীকার করা হচ্ছিল। এ জন্য মক্কার কাফেরদেরকে অত্যন্ত কঠোরভাবে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে এবং শেষে তাদেরকে এ মর্মে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, যে পয়গম্বরকে আজ তোমরা বিদ্রূপ করছো খুব শিগৃগির তোমাদের চোখের সামনেই তিনি তোমাদের ওপর বিজয় লাভ করবেন এবং তোমরা নিজেরাই আল্লাহর সেনাদলকে তোমাদের গৃহের আঙিনায় প্রবেশ করতে দেখবে। (১৭১–১৭৯ আয়াত) এমন এক সময় এ ঘোষণা দেয়া হয় যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাফল্যের লক্ষণ বহু দূরেও কোথাও দৃষ্টিগোচর হয়নি। মুসলমানরা (যাদেরকে এ আয়াতে আল্লাহর সেনাদল বলা হয়েছে) ভয়াবহ জুলুম–নির্যাতনের শিকার হচ্ছিল। তাদের তিন–চতুর্থাংশ দেশ ত্যাগ করেছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বড় জোর ৪০–৫০ জন সাহাবী মক্কায় থেকে গিয়েছিলেন এবং চরম অসহায় অবস্থার মধ্যে সবরকমের উৎপীড়ন–নিপীড়ন বরদাশত করে যাচ্ছিলেন। এহেন অবস্থায় বাহ্যিক কার্যকারণগুলো প্রত্যক্ষ করে কোন ব্যক্তি ধারণা করতে পারতো না যে, শেষ পর্যন্ত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সহায় সম্বলহীন ক্ষুদ্র দলটি বিজয় লাভ করবে। বরং প্রত্যক্ষকারীরা মনে করছিল, এ আন্দোলনের সমাধি মক্কার পার্বত্য উপত্যকার মধ্যেই রচিত হয়ে যাবে। কিন্তু ১৫–১৬ বছরের বেশী সময় অতিবাহিত হয়নি, মক্কা বিজয়ের সময় ঠিক সে একই ঘটনা ঘটে গেলো যে ব্যাপারে কাফেরদেরকে আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছিল।

সতর্কবাণী উচ্চারণ করার সাথে সাথে আল্লাহ এ সূরায় পুরোপুরি ভারসাম্য রক্ষা করে বুঝাবার ও উৎসাহিত-উদ্দীপিত করার দায়িত্ব পালন করেছেন। তাওহীদ ও আখেরাত বিশ্বাসের নির্ভুলতার সপক্ষে সংক্ষিপ্ত ও হৃদয়গ্রাহী যুক্তি পেশ করেছেন। মুশরিকদের আকীদা-বিশ্বাসের সমালোচনা করে তারা কেমন বাজে অর্থহীন বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে সে সম্পর্কে তাদেরকে সজাগ করেছেন। তাদের এসব বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার ফল তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। এ সংগে ঈমান ও সৎকাজের ফল কত মহান ও গৌরবময় তা শুনিয়ে দিয়েছেন। তারপর এ প্রসংগে ইতিহাস থেকে এমন সব উদাহরণ তুলে ধরেছেন যা থেকে জানা যায় আল্লাহ তাঁর নবীদের এবং তাঁদের সম্প্রদায়ের সাথে কি ব্যবহার করেছেন, নিজের বিশ্বস্ত বান্দাদেরকে তিনি কিভাবে পুরস্কৃত করেছেন এবং কিভাবে তাদের প্রতি মিথ্যা আরোপকারীদেরকে শাস্তি দিয়েছেন।

যে ঐতিহাসিক ঘটনাটি এ সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী শিক্ষণীয় বিষয়টি হচ্ছে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পবিত্র জীবনের এ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি যে, আল্লাহর একটি ইশারাতেই তিনি নিজের একমাত্র পুত্রকে কুরবানী দিতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। এর মধ্যে কেবলমাত্র কুরাইশদের যেসব কাফেররা হযরত ইবরাহীমের (আ) সাথে নিজেদের বংশগত সম্পর্কের জন্য অহংকার করতো তাদের জন্যই শিক্ষা ছিল তা নয় বরং এমন মুসলমানদের জন্যও শিক্ষা ছিল যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছিলেন। এ ঘটনা শুনিয়ে তাদেরকে বলা হয়েছে, ইসলামের তাৎপর্য ও তার মূল প্রাণশক্তি কি এবং তাকে নিজেদের দীন তথা জীবন ব্যবস্থায় পরিণত করার পর একজন সত্যিকার মু'মিনকে কিভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির খাতিরে নিজের সবকিছু কুরবানী করে দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়।

সূরার শেষ আয়াতগুলো কাফেরদের জন্য নিছক সতর্কবাণীই ছিল না বরং যেসব মু'মিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমর্থন ও তাঁর সাথে সহযোগিতা করে চরম নৈরাশ্যজনক অবস্থার মোকাবিলা করছিলেন তাঁদের জন্যও ছিল সুসংবাদ। তাঁদেরকে এসব আয়াত শুনিয়ে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, কাজের সূচনা করতে গিয়ে তাঁদেরকে যেসব বিপদ আপদের মুখোমুখি হতে হচ্ছে তাতে যেন তাঁরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে না পড়েন, শেষ পর্যন্ত বিজয় তাঁদেরই পদচুম্বন করবে এবং বাতিলের যে পতাকাবাহীদেরকে বর্তমানে বিজয়ীর আসনে দেখা যাচ্ছে, তারা তাঁদেরই হাতে পরাজিত ও পর্যুদস্ত হবে। মাত্র কয়েক বছর পরেই ঘটনাবলী জানিয়ে দিল, এটি নিছক আল্লাহর সান্ত্বনাবাণীই ছিল না বরং ছিল একটি বাস্তব ঘটনা এবং পূর্বাহ্নেই এর খবর দিয়ে তাদের মনোবল শক্তিশালী ও জোরদার করা হয়েছিল।

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۝١ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۝٢ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۝٣ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۝٤ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۝٥

*সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মানদের কসম, তারপর যারা ধমক ও অভিশাপ দেয় তাদের কসম, তারপর তাদের কসম যারা উপদেশবাণী শুনায়,[১] তোমাদের প্রকৃত মাবুদ মাত্র একজনই[২]—যিনি পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর এবং পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে যা কিছু আছে তাদের সবার মালিক এবং সমস্ত উদয়স্থলের[৩] মালিক।[৪]*

১. মুফাস্সিরদের অধিকাংশ এ ব্যাপারে একমত যে, এ তিনটি দলই হচ্ছে ফেরেশ্তাদের দল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হযরত কাতাদাহ (রা), মাসরূক, সাঈদ ইবনে জুবাইর, ইকরামা, মুজাহিদ, সুদ্দী, ইবনে যায়েদ ও রাবী' ইবনে আনাস থেকেও এ একই তাফসীর উদ্ধৃত হয়েছে। কোন কোন তাফসীরকার এর অন্য ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে এ ব্যাখ্যাটিই বেশী সামঞ্জস্যশীল বলে মনে হয়।

এখানে "সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো"—এর মাধ্যমে এদিকে ইংগিত করা হয়েছে যে, বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনায় যেসব ফেরেশ্তা নিয়োজিত রয়েছে তারা আল্লাহর বান্দা ও গোলাম। তারা সারিবদ্ধভাবে তাঁর বন্দেগী ও আনুগত্য করছে এবং তাঁর হুকুম তামিল করার জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত রয়েছে। সামনের দিকে গিয়ে ১৬৫ আয়াতে এ বিষয়বস্তুটির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। সেখানে ফেরেশ্তারা নিজেদের সম্পর্কে বলছে ঃ

وَاِنَّا لَنَحْنُ الصَّآفُّوْنَ

কোন কোন মুফাস্সিরের মতে "ধমক ও অভিশাপ দেবার" অর্থ হচ্ছে, কিছু ফেরেশ্তা আছে তারা মেঘমালাকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় এবং বৃষ্টির ব্যবস্থা করে। যদিও এ অর্থও ভুল নয়, কিন্তু সামনের দিকের বিষয়বস্তুর সাথে যে অর্থ বেশী মানানসই তা হচ্ছে এই যে, ঐ ফেরেশ্তাদের মধ্যে একটি দল নাফরমানদেরকে ও অপরাধীদেরকে অভিশাপ দিয়ে থাকে এবং তাদের এ অভিশাপ কেবল শাব্দিক হয় না বরং তা মানুষের ওপর বড় বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ঐতিহাসিক বিপদ মুসিবতের আকারে বর্ষিত হয়।

"উপদেশবাণী শুনাবার" অর্থ হচ্ছে ঐ ফেরেশ্‌তাদের মধ্যে এমন ধরনের ফেরেশ্‌তাও আছে যারা মানুষকে সত্য বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য উপদেশ দেবার দায়িত্ব পালন করে। সে উপদেশ দুর্যোগ দুর্ঘটনাদির আকারেও হয়, যা থেকে শিক্ষা গ্রহণকারীরা শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। আবার তা এমন শিক্ষার আকারেও হয়, যা ঐ ফেরেশ্‌তাদের মাধ্যমে নবীদের ওপর নাযিল হয়। আবার কখনো তা হয় তাদের মাধ্যমে সৎকর্মশীল লোকদের ওপর নাযিলকৃত ইলহাম অর্থাৎ অভাবনীয় পন্থায় মানুষের মনে আল্লাহ যে প্রেরণার (Inspiration) সঞ্চার করেন তার আকারেও।

২. এ সত্যটির ভিত্তিতেই উল্লেখিত গুণাবলী সমৃদ্ধ ফেরেশ্‌তাদের কসম খাওয়া হয়েছে। অন্য কথায় যেন বলা হয়েছে, এ সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থা যা আল্লাহর আনুগত্যের ভিত্তিতে সক্রিয় রয়েছে, এ বিশ্ব-জাহানের এমন সমস্ত নিদর্শন যেগুলো আল্লাহর বন্দেগী বিমুখতার অশুভ ফল মানুষের সামনে তুলে ধরছে এবং বিশ্ব-জাহানের এ আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা যার ফলে সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত অবিরাম একই সত্যের কথা বিভিন্নভাবে স্মরণ করানো হচ্ছে—এ সবকিছুই মানুষের "ইলাহ" যে একজন, তারই সাক্ষ পেশ করছে।

"ইলাহ" শব্দটির ব্যবহার হয় দু'টি অর্থে। এক, এমন মাবুদ ও উপাস্য অর্থে, বাস্তবে ও সক্রিয়ভাবে যার বন্দেগী করা হচ্ছে। দুই, সে মাবুদ অর্থে, যিনি এমন মর্যাদার অধিকারী, যার ফলে প্রকৃতপক্ষে তাঁরই ইবাদাত ও বন্দেগী করা উচিত। এখানে ইলাহ শব্দটি দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ প্রথম অর্থে মানুষ তো বহু ইলাহ তৈরি করে রেখেছে। এ জন্য আমি ইলাহ শব্দটির অনুবাদ করেছি "প্রকৃত মাবুদ"।

৩. সূর্য সবসময় একই উদয়স্থল থেকে উদিত হয় না। বরং প্রতিদিন একটি নতুন স্থান থেকে উদিত হয়। তাছাড়া সারা দুনিয়ায় সে একই সময় উদিত হয় না বরং দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সময় উদিত হয়। এসব কারণে উদয়স্থলের পরিবর্তে "সমস্ত উদয়স্থল" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং এ সংগে "সমস্ত অস্তস্থল"-এর কথা না বলার কারণ হচ্ছে এই যে, সমস্ত উদয়স্থল শব্দেই সমস্ত অস্তস্থল প্রমাণ করে। তবুও এক জায়গায় رب المشارق والمغارب (উদয়স্থলগুলো ও অস্তস্থলগুলোর রব) শব্দগুলোও এসেছে। (আল মা'আরিজ, ৪০)

৪. এ আয়াতগুলোতে যে সত্যটি বুঝানো হয়েছে সেটি হচ্ছে এই যে, বিশ্ব-জাহানের আসল মালিক ও শাসনকর্তাই মানুষের আসল মা'বুদ। তিনিই প্রকৃতপক্ষে মা'বুদ হতে পারেন এবং তাঁরই মাবুদ হওয়া উচিত। রব (মালিক, শাসনকর্তা ও প্রতিপালক) হবে একজন এবং ইলাহ (ইবাদাত লাভের অধিকারী) হবে অন্যজন, এটা একেবারেই বুদ্ধি বিরোধী কথা। মানুষের লাভ ও ক্ষতি, তার অভাব ও প্রয়োজন পূর্ণ হওয়া, তার ভাগ্য ভাঙা-গড়া বরং তার নিজের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বই যার ক্ষমতার অধীন তার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য স্বীকার করা এবং তার সামনে নত হওয়া মানুষের প্রকৃতিরই দাবী। এটিই তার ইবাদাতের মৌল কারণ। মানুষ যখন একথাটি বুঝতে পারে তখন আপনা আপনি সে একথাটিও বুঝতে পারে যে, ক্ষমতার অধিকারীর ইবাদাত না করা এবং ক্ষমতাহীনের ইবাদাত করা দু'টোই বুদ্ধি ও প্রকৃতির সুস্পষ্ট বিরোধী। কর্তৃত্বশালী ইবাদাত লাভের হকদার হন। কর্তৃত্বহীন সত্তারা এর হকদারও হয় না। তাদের ইবাদাত করে এবং তাদের

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ﴿٦﴾ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ﴿٧﴾ لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾ دُحُورًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴿٩﴾ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١٠﴾ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا ۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَّازِبٍ ﴿١١﴾ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ﴿١٣﴾

*আমি দুনিয়ার আকাশকে[৫] তারকারাজির সৌন্দর্য দ্বারা সুসজ্জিত করেছি এবং প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে তাকে সুরক্ষিত রেখেছি।[৬] এ শয়তানরা উর্ধ জগতের কথা শুনতে পারে না, সবদিক থেকে আঘাতপ্রাপ্ত ও তাড়িত হয় এবং তাদের জন্য রয়েছে অবিরাম শাস্তি। তবুও যদি তাদের কেউ তার মধ্য থেকে কিছু হাতিয়ে নিতে সক্ষম হয় তাহলে একটি জ্বলন্ত অগ্নিশিখা তার পেছনে ধাওয়া করে।[৭]*

*এখন এদেরকে জিজ্ঞেস করো, এদের সৃষ্টি বেশী কঠিন, না আমি যে জিনিসগুলো সৃষ্টি করে রেখেছি সেগুলোর?[৮] এদেরকে তো আমি সৃষ্টি করেছি আঠাল কাদামাটি দিয়ে।[৯] তুমি তো (আল্লাহর কুদরাতের মহিমা দেখে) অবাক হচ্ছো এবং এরা তার প্রতি করছে বিদ্রূপ। তাদেরকে বুঝালেও তারা বোঝে না।*

কাছে কিছু চেয়ে কোন লাভও হয় না। কারণ আমাদের কোন আবেদনের ভিত্তিতে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার কোন ক্ষমতাই তাদের নেই। তাদের সামনে বিনয়, দীনতা ও কৃতজ্ঞতা সহকারে মাথা নত করা এবং তাদের কাছে প্রার্থনা করা ঠিক তেমনিই নির্বুদ্ধিতার কাজ যেমন কোন ব্যক্তি কোন শাসনকর্তার সামনে হাজির হয়ে তার কাছে আর্জি পেশ করার পরিবর্তে অন্য প্রার্থীরা যারা সেখানে আবেদনপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাদের মধ্য থেকে কারো সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে।

৫. দুনিয়ার আকাশ বলতে বুঝানো হয়েছে নিকটবর্তী আকাশকে, কোন দূরবীনের সাহায্য ছাড়াই খালি চোখে যে আকাশকে আমরা দেখতে পাই। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রকার শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যে বিশ্বকে আমরা দেখি এবং আমাদের পর্যবেক্ষণ যন্ত্রপাতির মাধ্যমে যেসব বিশ্ব এখনো আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি সেগুলো সবই দূরবর্তী

আকাশ। এ প্রসংগে মনে রাখতে হবে "সামা" বা আকাশ কোন নির্দিষ্ট জিনিসের নাম নয়। বরং প্রাচীনতমকাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত মানুষ এ শব্দটি এবং এর সমার্থক শব্দাবলীকে উর্ধ জগতের জন্য ব্যবহার করে আসছে।

৬. অর্থাৎ উর্ধজগত নিছক মহাশূন্য নয়। যে কেউ চাইলেই তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। বরং এর বাঁধন অত্যন্ত মজবুত। এর বিভিন্ন অংশকে এমন সুদৃঢ় সীমান্ত দ্বারা পরিবেষ্টিত করা হয়েছে যার ফলে কোন বিদ্রোহী শয়তানের পক্ষে সে সীমানাগুলো অতিক্রম করা সম্ভব নয়। বিশ্ব–জাহানের প্রত্যেকটি গ্রহ নক্ষত্রের নিজস্ব একটি কক্ষপথ ও আকাশ (Sphere) আছে। তার মধ্য থেকে কারো বের হয়ে আসা যেমন অত্যন্ত কঠিন তেমনি বাইর থেকে কারো তার মধ্যে প্রবেশ করাও সহজ নয়। বাইরের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে নিছক মহাশূন্য ছাড়া সেখানে আর কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু আসলে সে মহাশূন্যের মধ্যে অসংখ্য ও অগণিত অংশকে এমন শক্তিশালী ও সুদৃঢ় সীমানা দিয়ে সংরক্ষিত করা হয়েছে যার মোকাবিলায় লৌহ প্রাচীর কিছুই নয়। মানুষের কাছের প্রতিবেশী চাঁদে পৌঁছুতে মানুষকে যেসব বিচিত্র সমস্যা ও বহুমুখী প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তা থেকে এ ব্যাপারে কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে। পৃথিবীর অন্যান্য জীব অর্থাৎ জিনদের উর্ধজগতে প্রবেশ করার পথেও এমনি ধরনের বাধা–প্রতিবন্ধকতা রয়েছে।

৭. এ বিষয়টি বুঝতে হলে একটি কথা অবশ্যই দৃষ্টি সমক্ষে থাকতে হবে। সে সময় আরবে জ্যোতিষশাস্ত্রের ব্যাপক চর্চা ছিল। বিভিন্ন স্থানে গণক ও জ্যোতিষীরা বসে ভবিষ্যদ্বাণী করতো। অদৃশ্যের সংবাদ দিত। হারিয়ে যাওয়া জিনিসের সন্ধান দিত। লোকেরা নিজেদের অতীত ও ভবিষ্যতের অবস্থা জানার জন্য তাদের দ্বারস্থ হতো। এ গণকদের দাবী ছিল, জিন ও শয়তানরা তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং তারা তাদেরকে সব ধরনের খবর এনে দেয়। এ পরিবেশে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াতের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন এবং তিনি কুরআন মজীদের আয়াত শুনাতে শুরু করেন। তাতে অতীতের ইতিহাস এবং ভবিষ্যতে যেসব অবস্থার সৃষ্টি হবে তার খবর দেয়া হয়েছিল। এ সংগে তিনি জানিয়ে দেন, একজন ফেরেশ্‌তা আমার কাছে এসব আয়াত নিয়ে আসেন এতে তাঁর বিরোধীরা সংগে সংগেই তাঁকে গণক বলে পরিহাস করতে থাকে। তারা লোকদেরকে বলতে থাকে, অন্যান্য গণকদের মতো তাঁর সম্পর্কও এমন কোন শয়তানের সাথে রয়েছে যে উর্ধজগত থেকে আড়ি পেতে কিছু শুনে তাঁর কাছে নিয়ে আসে এবং তিনি তাকে আল্লাহর অহী বানিয়ে পেশ করে দেন। এ অপবাদের জবাবে আল্লাহ যে সত্য বিবৃত করছেন তা এই যে, শয়তানরা তো উর্ধজগতে পৌঁছতেই পারে না। ফেরেশ্‌তাদের কথা শোনা এবং তা নিয়ে এসে কাউকে বলার ক্ষমতা তাদের নেই। আর যদি ঘটনাক্রমে সামান্য একটু ছিটে ফোঁটা তথ্য কোন শয়তানের কানে পড়ে যায় তাহলে সে তা নিয়ে নিচে নেমে আসার আগেই একটি দ্রুতগামী অগ্নিশিখা তার পিছু নেয়। অন্যকথায় এর অর্থ হচ্ছে ফেরেশ্‌তাদের মাধ্যমে বিশ্ব–জাহানের যে বিশাল ব্যবস্থা চলছে তা পুরোপুরি শয়তানদের হস্তক্ষেপ মুক্ত। তাতে হস্তক্ষেপ করাতো দূরের কথা সে সম্পর্কে কিছু জানার ক্ষমতাও তাদের নেই। (আরো বেশী জানতে হলে তাফহীমুল কুরআন সূরা আল হাজ্‌র, ৮ থেকে ১২ টীকা দেখুন।)

وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴿١٤﴾ وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿١٦﴾ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٧﴾ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴿١٨﴾ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿٢٠﴾ هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢١﴾

*কোনো নিদর্শন দেখলে উপহাস করে উড়িয়ে দেয় এবং বলে, "এ তো স্পষ্ট যাদু।[১০] আমরা যখন মরে একেবারে মাটি হয়ে যাবো এবং থেকে যাবে শুধুমাত্র হাড়ের পিঞ্জর তখন আমাদের আবার জীবিত করে উঠানো হবে, এমনও কি কখনো হতে পারে? আর আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকেও কি উঠানো হবে?" এদেরকে বলো, হাঁ, এবং তোমরা (আল্লাহর মোকাবিলায়) অসহায়।[১১]*

*ব্যস, একটিমাত্র বিকট ধমক হবে এবং সহসাই এরা স্বচক্ষে (সেই সবকিছু যার খবর দেয়া হচ্ছে) দেখতে থাকবে।[১২] সে সময় এরা বলবে, হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য, এতো প্রতিফল দিবস—"এটা সে ফায়সালার দিন যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে।"[১৩]*

৮. আখেরাত সম্পর্কে মক্কার কাফেররা যে সন্দেহ পেশ করতো এটি তার জওয়াব। তাদের মতে আখেরাত সম্ভব নয়। কারণ যেসব মানুষ মরে গেছে তাদের আবার দ্বিতীয়বার জন্মলাভ করা অসম্ভব। এর জবাবে আখেরাতের সম্ভাবনার যুক্তি পেশ করতে গিয়ে আল্লাহ সর্বপ্রথম তাদের সামনে এ প্রশ্ন রাখেন, তোমাদের মতে যদি মৃত মানুষদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা অনেক কঠিন কাজ হয়ে থাকে এবং এ সৃষ্টি করার ক্ষমতা আমার না থেকে থাকে তাহলে বলো, এ পৃথিবী ও আকাশ এবং এদের মধ্যে যে অসংখ্য জিনিস রয়েছে এগুলো সৃষ্টি করা কি সহজ কাজ? তোমাদের বুদ্ধি কোথায় হারিয়ে গেছে? যে আল্লাহর জন্য এ বিশাল বিশ্ব-জাহান সৃষ্টি করা কঠিন কাজ ছিল না এবং যিনি তোমাদের নিজেদেরকে একবার সৃষ্টিও করেছেন তাঁর ব্যাপারে তোমরা কেমন করে ভাবতে পারলে যে, তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করতে তিনি অক্ষম?

৯. অর্থাৎ এ মানুষ তো কোন বিরাট জিনিস নয়। মাটি দিয়ে একে তৈরি করা হয়েছে এবং এ মাটি দিয়ে আবার তৈরি করা যেতে পারে। আঠাল কাদামাটি দিয়ে মানুষ তৈরি করার অর্থ এও হতে পারে যে, প্রথম মানুষটিকে সৃষ্টি করা হয়েছিল মাটি দিয়ে এবং তারপর মানুষের বংশধারা ঐ প্রথম মানুষটির শুক্রবীজ থেকে অস্তিত্বলাভ করেছে। এর

অর্থ এও হতে পারে যে, প্রত্যেকটি মানুষ আঠাল কাদামাটির তৈরি। কারণ মানুষের অস্তিত্বের সমস্ত উপাদান মাটি থেকেই লাভ করা হয়। যে বীর্যে তার জন্ম তা খাদ্য থেকে তৈরি এবং গর্ভসঞ্চার থেকে শুরু করে মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তার সমগ্র অস্তিত্ব যেসব উপাদানে তৈরি হয় তার খাদ্যই তার সবটুকু সরবরাহ করে। এ খাদ্য পশু ও জীবজন্তু থেকে সরবরাহকৃত হোক বা উদ্ভিদ থেকে মূলত এর উৎস হচ্ছে মাটি, যা পানির সাথে মিশে মানুষের খাদ্য হওয়ার এবং তরকারী ও ফল উৎপন্ন করার যোগ্যতা অর্জন করে এবং জীবজন্তু লালন করারও যোগ্যতা অর্জন করে, যাদের দুধ ও গোশ্ত মানুষ আহার করে।

কাজেই যুক্তির বুনিয়াদ এরি ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, এ মাটি যদি জীবন গ্রহণ করার যোগ্যতা না রাখতো তাহলে তোমরা কেমন করে জীবিত আকারে দুনিয়ার বুকে বিরাজ করছো? আর যদি তার মধ্যে জীবন সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে থাকে, যেমন তোমাদের অস্তিত্বই এ সম্ভাবনার দ্ব্যর্থহীন প্রমাণ পেশ করছে, তাহলে আগামীকাল এ একই মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি অসম্ভব হবে কেন?

১০. অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক জগতের কথা। এ ব্যক্তি বলছে কোন ঐন্দ্রজালিক জগতের কথা। সেখানে মৃতরা পুনরুজ্জীবিত হবে। আদালত প্রতিষ্ঠিত হবে। জান্নাত আবাদ করা হবে। জাহান্নামীদের শাস্তি বিধান করা হবে। অথবা এর এ অর্থও হতে পারে যে, এ ব্যক্তি মন ভুলানো কথা বলছে। এর এ কথাগুলোই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে, কেউ এর ওপর যাদু করে দিয়েছে, যার ফলে এ সুস্থ-সচেতন ব্যক্তিটি এখন এ ধরনের আবোল-তাবোল কথা বলছে।

১১. অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে যা ইচ্ছা তাই বানাতে পারে। যখন তিনি চাইলেন তখনই তাঁর একটি ইশারাতেই তোমরা অস্তিত্ব লাভ করলে। যখন তিনি চাইবেন তখনই তাঁর একটি ইংগিতেই তোমরা মৃত্যু বরণ করবে। আবার যখন তিনি চাইবেন সাথে সাথেই তাঁর একটি ইংগিতই তোমাদেরকে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবে।

১২. অর্থাৎ এ ঘটনা সংঘটিত হবার সময় যখন এসে যাবে তখন দুনিয়াকে পুনরায় উত্থিত করা কোন কঠিন কাজ হবে না। একটিমাত্র বিকট ধমক ঘুমন্তদেরকে জাগিয়ে উঠিযে দেবার জন্য যথেষ্ট হবে। "বিকট ধমক" শব্দটি এখানে বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। এর মাধ্যমে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের এমন কিছু ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে যা থেকে বুঝা যায়, সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ মরে গিয়েছিল সবাই যেন শুয়ে ঘুমোচ্ছে এবং হঠাৎ কেউ ধমক দিয়ে বললো, "উঠে পড়ো" আর সংগে সংগেই মুহূর্তের মধ্যে তারা সবাই দাঁড়িয়ে গেলো।

১৩. হতে পারে মু'মিনরা তাদেরকে একথা বলে। এও হতে পারে, এটি ফেরেশ্তাদের উক্তি। এও হতে পারে, হাশরের ময়দানের সমগ্র পরিবেশ সে সময় সমকালীন পরিস্থিতির মাধ্যমে একথা বলছিল। আবার এও হতে পারে, এটা তাদের নিজেদেরই দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া। অর্থাৎ নিজেদের মনে মনে তারা নিজেদেরকেই সম্বোধন করে বলছিল, এ দুনিয়ায় সারা জীবন তোমরা একথা মনে করতে থেকেছো যে, ফায়সালা করার দিন কখনো আসবে না, কিন্তু এখন তোমাদের সর্বনাশের সময় এসে গেছে, যেদিনকে মিথ্যা বলতে সেদিনটি আজ তোমাদের সামনে উপস্থিত।

احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾ مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ﴿٢٤﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴿٢٥﴾ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٦﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٧﴾ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾

২ রুকূ'

*(হুকুম দেয়া হবে) ঘেরাও করে নিয়ে এসো সব জালেমকে,[১৪] তাদের সাথিদেরকে[১৫] এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব মাবুদদের তারা বন্দেগী করতো তাদেরকে[১৬] তারপর তাদের সবাইকে জাহান্নামের পথ দেখিয়ে দাও। আর এদেরকে একটু থামাও, এদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে। "তোমাদের কি হয়েছে, এখন কেন পরস্পরকে সাহায্য করো না? আরে, আজ তো এরা নিজেরাই নিজেদেরকে (এবং একজন অন্যজনকে) সমর্পণ করে দিয়ে যাচ্ছে।"[১৭] এরপর এরা একে অন্যের দিকে ফিরবে এবং পরস্পর বিতর্ক শুরু করে দেবে। (আনুগত্যকারীরা তাদের নেতাদেরকে) বলবে, "তোমরা তো আমাদের কাছে আসতে সোজা দিক দিয়ে।"[১৮]*

১৪. জালেম বলতে কেবল তাদেরকে বুঝানো হয়নি যারা অন্যের প্রতি জুলুম করেছে। বরং কুরআনের পরিভাষায় এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই জালেম যে আল্লাহর মোকাবিলায় বিদ্রোহ, সীমালংঘন ও নাফরমানির পথ অবলম্বন করেছে।

১৫. মূলে ازواج (আয্ওয়াজ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ তাদের এমন সব স্ত্রীও হতে পারে যারা এ বিদ্রোহে তাদের সহযোগী ছিল। আবার এমনসব লোকও হতে পারে যারা তাদেরই মতো বিদ্রোহী সীমালংঘনকারী ও নাফরমান ছিল। এ ছাড়া এর অর্থ এও হতে পারে যে, এক এক ধরনের অপরাধীকে আলাদা আলাদা জোটের আকারে একত্র করা হবে।

১৬. এখানে মাবুদদের অর্থ দু' ধরনের মাবুদ। এক, এমনসব মানুষ ও শয়তান যাদের নিজেদের ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা এ ছিল যে, লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের বন্দেগী করুক। দুই, এমনসব মূর্তি, গাছ, পাথর ইত্যাদি যাদের পূজায় দুনিয়াবাসীরা লিপ্ত ছিল। এর মধ্যে প্রথম ধরনের মাবুদরা নিজেরাই অপরাধীদের অন্তরভুক্ত হবে এবং শাস্তির জন্য তাদেরকে জাহান্নামের পথ দেখানো হবে। আর দ্বিতীয় ধরনের মাবুদদেরকে তাদের ইবাদাতকারীদের সাথে এ জন্য জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে যে, তারা এদেরকে দেখে সবসময় লজ্জা অনুভব করবে এবং নিজেদের নির্বুদ্ধিতার অনুশোচনা করতে থাকবে। এরা ছাড়া তৃতীয় আর এক ধরনের মাবুদ হচ্ছে, দুনিয়ায় যাদেরকে পূজা করা হয়েছে কিন্তু

قَالُوْا بَلْ لَّمْ تَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۞ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ ۚ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ۞ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ ۖ اِنَّا لَذَآئِقُوْنَ ۞ فَاَغْوَيْنٰكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ ۞ فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ۞ اِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ۞ اِنَّهُمْ كَانُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ۙ يَسْتَكْبِرُوْنَ ۞ وَيَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا لَتَارِكُوْٓا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ ۞

*তারা জবাব দেবে, "না, তোমরা নিজেরাই মু'মিন ছিলে না। তোমাদের ওপর আমাদের কোন জোর ছিল না। বরং তোমরা নিজেরাই ছিলে বিদ্রোহী। শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের রবের এ ফরমানের হকদার হয়ে গেছি যে, আমরা আযাবের স্বাদ গ্রহণ করবো। কাজেই আমরা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম কারণ আমরা নিজেরাই বিভ্রান্ত ছিলাম।"[১৯]*

*এভাবে তারা সবাই সেদিন শাস্তিতে শরীক হবে।[২০] আমি অপরাধীদের সাথে এমনটিই করে থাকি। এরা ছিল এমন সব লোক যখন এদেরকে বলা হতো, "আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই" তখন এরা অহংকার করতো এবং বলতো, "আমরা কি একজন উন্মাদ কবির জন্য আমাদের মাবুদদেরকে ত্যাগ করবো?"*

তারা কখনো তাদের পূজা-উপাসনা করার প্রতি ইংগিত করেনি। বরং তারা সবসময় মানুষকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পূজা করতে নিষেধ করেছেন। যেমন ফেরেশ্‌তা, আম্বিয়া ও আউলিয়া। এ ধরনের মাবুদদেরকে মোটেই অন্যান্য মাবুদদের মতো তাদের উপাসনাকারীদের সাথে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে না।

১৭. প্রথম বাক্যটি বলা হবে অপরাধীদেরকে সম্বোধন করে। দ্বিতীয় বাক্যটি উপস্থিত এমনসব সাধারণ ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে বলা হবে যারা সে সময় জাহান্নামের পথে অপরাধীদের রওয়ানা হবার দৃশ্য দেখতে থাকবে। এ বাক্যটি নিজেই জানিয়ে দিচ্ছে সে সময় অবস্থাটা কেমন হবে। বড় বড় তাগড়া অপরাধীদের কোমরের বল শেষ হয়ে যাবে। কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে তারা কান ধরে জাহান্নামের দিকে চলে যেতে থাকবে। কোথাও কোন 'জাহাঁপনা' ধাক্কা খেতে থাকবে এবং দরবারীদের মধ্য থেকে কেউ সেই "মহামতি মহামহিমকে" উদ্ধার করতে এগিয়ে আসবে না। কোথাও কোন বিশ্ব বিজয়ী ও কোন ডিরেক্টর চরম লাঞ্ছনা সহকারে চলে যেতে থাকবে এবং তার পরাক্রমশালী সেনাদল নিজেরাই তাকে দণ্ড দেবার জন্য এগিয়ে দেবে। কোথাও কোন পীর সাহেব বা গুরুজী অথবা হোলি ফাদার জাহান্নামের শাস্তি লাভ করবে এবং মুরীদদের

بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣٧﴾ اِنَّكُمْ لَذَآئِقُوا الْعَذَابِ الْاَلِيْمِ ﴿٣٨﴾ وَمَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٣٩﴾

*অথচ সে সত্য নিয়ে এসেছিল এবং রসূলদেরকে সত্য বলে মেনে নিয়েছিল[২১] (এখন তাদেরকে বলা হবে) তোমরা নিশ্চিতভাবেই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করবে এবং পৃথিবীতে তোমরা যে সমস্ত কাজ করতে তারই প্রতিদান তোমাদের দেয়া হচ্ছে।*

একজনও "হুজুরে আলা'র মর্যাদাহানির কথা ভাববে না। কোথাও কোন জাতীয় নেতা বড়ই হীনতার মধ্যে জাহান্নামের পথে যাত্রা করবে এবং দুনিয়ায় যেসব লোক তার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যের ঝাণ্ডা বুলন্দ করে বেড়াতো তারা সবাই তার দিক থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নেবে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যে প্রেমিক দুনিয়ায় তার প্রেমাস্পদের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত ছিল সেও তার প্রেমাস্পদের দুরবস্থার দিকে ভ্রুক্ষেপই করবে না। এ অবস্থার চিত্র এঁকে মহান আল্লাহ আসলে একথা বুঝাতে চান যে, দুনিয়ায় মানুষের সাথে মানুষের যে সম্পর্ক খোদাদ্রোহিতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে তা কিভাবে আখেরাতে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে এবং এখানে যারা নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে মত্ত হয়ে আছে সেখানে তাদের অহংকারের দেয়াল কিভাবে মিসমার হয়ে যাবে।

১৮. মূলে বলা হয়েছে ঃ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ "তোমরা আমাদের কাছে আসতে ইয়ামীনের পথে।" ইয়ামীন শব্দটি আরবী ভাষায় বিভিন্ন অর্থে বলা হয়। যদি একে শক্তি অর্থে বলা হয়, তাহলে এর অর্থ হবে আমরা দুর্বল ছিলাম, তোমরা আমাদের ওপর প্রাধান্য লাভ করেছিলে তাই তোমরা নিজেদের শক্তি ব্যবহার করে আমাদের গোমরাহীর দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলে। যদি একে কল্যাণ অর্থে নেয়া হয়, তাহলে এর অর্থ হবে, তোমরা কল্যাণকামী সেজে আমাদের ধোঁকা দিয়েছো। তোমরা আমাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছিলে, যে পথে তোমরা আমাদের চালাচ্ছো এটিই সত্য ও কল্যাণের পথ। তাই আমরা ধোঁকায় পড়ে গিয়েছিলাম। আর যদি একে কসম অর্থে গ্রহণ করা হয়, তাহলে এর অর্থ হবে তোমরা কসম খেয়ে খেয়ে আমাদের নিশ্চিন্ত করতে যে, তোমরা যা পেশ করছো তা–ই সত্য।

১৯. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাবা, ৫১, ৫২, ৫৩ টীকা।

২০. অর্থাৎ নেতা ও অনুসারী এবং গোমরাহ ও গোমরাহকারী উভয়ই একই শাস্তি লাভ করবে। অনুসারীদের এ ওযর মেনে নেয়া হবে না যে, তারা নিজেরা গোমরাহ হয়নি বরং তাদেরকে গোমরাহ করা হয়েছিল। অন্যদিকে নেতাদের এ ওযরও গ্রহণ করা হবে না যে, গোমরাহ লোকেরা নিজেরাই সরল–সত্য পথের প্রত্যাশী ছিল না।

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ﴿٤١﴾ فَوَاكِهُ ۖ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴿٤٢﴾ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٤٣﴾ عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٤٤﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ﴿٤٥﴾ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ﴿٤٦﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴿٤٧﴾ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ﴿٤٨﴾ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ﴿٤٩﴾

*কিন্তু আল্লাহর নির্বাচিত বান্দারা (এ অশুভ পরিণাম) মুক্ত হবে। তাদের জন্য রয়েছে জ্ঞাত রিযিক,[২২] সব রকমের সুস্বাদু জিনিস[২৩] এবং নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত, যেখানে তাদেরকে মর্যাদা সহকারে রাখা হবে। বসবে তারা আসনে মুখোমুখি। শরাবের[২৪] ঝরণা[২৫] থেকে পানপাত্র ভরে ভরে তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে।[২৬] উজ্জ্বল শরাব, পানকারীদের জন্য হবে সুস্বাদু। তা তাদের কোন শারীরিক ক্ষতি করবে না এবং তাতে তাদের বুদ্ধিও ভ্রষ্ট হবে না।[২৭] আর তাদের কাছে থাকবে আনত নয়না[২৮] সুলোচনা নারীগণ,[২৯] এমন নাজুক যেমন হয় ডিমের খোসার নিচে লুকানো ঝিল্লি।[৩০]*

২১. রসূলদেরকে সত্য বলে মেনে নেয়ার তিনটি অর্থ রয়েছে এবং এ তিনটি অর্থই এখানে প্রযুক্ত। এক, তিনি পূর্ববর্তী এমন কোন রসূলের বিরোধিতা করেননি যার অনুসারীদের তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করার কোন যুক্তিসংগত কারণ থাকতো। বরং তিনি আল্লাহর সমস্ত পূর্ববর্তী রসূলকে সত্য বলতেন। দুই, তিনি কোন নতুন ও অভিনব কথা আনেননি। বরং শুরু থেকে আল্লাহর সব রসূল যে কথা বলে আসছিলেন তিনিও সে একই কথা পেশ করতেন। তিন, পূর্ববর্তী রসূলগণ তাঁর সম্পর্কে যেসব খবর দিয়েছিলেন তিনি সেগুলোর সঠিক প্রয়োগক্ষেত্র ছিলেন।

২২. অর্থাৎ এমন রিযিক যার সমস্ত গুণাবলী বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। যা পাওয়ার ব্যাপারে তারা নিশ্চিত। যে ব্যাপারে তারা একেবারে নিশ্চিন্ত যে, তা তারা চিরকাল পেতে থাকবে। যে ব্যাপারে কি পাওয়া যাবে কি না পাওয়া যাবে, এ ধরনের কোন অনিশ্চয়তা নেই।

২৩. এর মধ্যে এদিকেও একটি সূক্ষ্ম ইশারা রয়েছে যে, জান্নাতে আহার্য দ্রব্যাদি খাদ্য হিসেবে নয় বরং স্বাদ উপভোগের জন্য ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ সেখানে খাবার এ উদ্দেশ্যে খাওয়া হবে না যে, শরীরের ক্ষয় হয়ে যাওয়া অংশগুলোর শূন্যতা পূরণ করা হবে। কারণ সে চিরন্তন জীবনে শরীরের অংশগুলোর কোন ক্ষয়ই হবে না। মানুষের সেখানে ক্ষুধাও লাগবে না। এ দুনিয়ায় শরীরের অংশের ক্ষয়ের কারণে মানুষের ক্ষুধা পায়। আর শরীর নিজেকে জীবিত রাখার জন্য সেখানে খাদ্যও চাইবে না। এ কারণে জান্নাতের খাদ্যের জন্য فواكه (ফাওয়াকেহ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থের মধ্যে "খাদ্যে পরিণত হওয়া" এর পরিবর্তে "স্বাদ উপভোগ করা" এর অর্থ অধিকতর লক্ষণীয়।

২৪. আসলে এখানে শরাব শব্দটি সুস্পষ্ট করে বলা হয়নি। বরং শুধুমাত্র كَأس (পানপাত্র) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু আরবী ভাষায় كَأس শব্দটি ব্যবহার করে সবসময় শরাব অর্থই গ্রহণ করা হয়। যে পেয়ালায় শরাবের পরিবর্তে দুধ বা পানি থাকে অথবা যে পেয়ালায় কিছুই থাকে না তাকে كاس (কাস) বলা হয় না। "কাস" শব্দটি একমাত্র তখনই বলা হয় যখন তার মধ্যে মদ থাকে।

২৫. অর্থাৎ দুনিয়ায় ফল ও খাদ্য বস্তু পচিয়ে যে শরাব তৈরি করা হয় এ শরাব তেমন ধরনের হবে না। বরং তা প্রাকৃতিকভাবে ঝরণা থেকে উৎসারিত হবে এবং নদীর আকারে প্রবাহিত হবে। সূরা মুহাম্মাদে এ বিষয়বস্তুটি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ

"আর শরাবের নদী, যা পানকারীদের জন্য হবে সুস্বাদু।"

২৬. শরাবের পানপাত্র নিয়ে ঘুরে ঘুরে জান্নাতীদের মধ্যে কারা পরিবেশন করবে সেকথা এখানে বলা হয়নি। এর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে অন্যান্য স্থানে ঃ

وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ

"আর তাদের খিদমত করার জন্য ঘুরবে তাদের খাদেম ছেলেরা যারা এমন সুন্দর যেমন ঝিনুকে লুকানো মোতি।" (আত্ তূর, ২৪)

وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا

"আর তাদের খিদমত করার জন্য ঘুরে ফিরবে এমন সব বালক যারা হামেশা বালকই থাকবে। তোমরা তাদেরকে দেখলে মনে করবে মোতি ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে।"

(আদ দাহ্‌র, ১৯)

তারপর এর বিস্তারিত বর্ণনা হযরত আনাস (রা) ও হযরত সামুরাহ ইবনে জুন্‌দুবের (রা) বর্ণিত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসগুলো থেকে পাওয়া যায়। সেগুলোতে বলা হয়েছে "মুশরিকদের সন্তানরা জান্নাতবাসীদের সেবক হবে।" (আবু দাউদ তায়ালিসী, তাবারানী ও বায্‌যার) এ হাদীসগুলো সনদের দিক দিয়ে দুর্বল হলেও অন্যান্য বহু হাদীস থেকেও জানা যায়, যে শিশুরা বয়প্রাপ্ত না হয়ে মারা যায় তারা জান্নাতে যাবে। তাছাড়া একথাও হাদীস থেকে জানা যায় যে, যেসব শিশুর পিতামাতা জান্নাতবাসী হবে তারা নিজেদের বাপ–মায়ের সাথে থাকবে, যাতে তাদের চোখ শীতল হয়। এরপর অবশ্যই এমন সব শিশু থেকে যায় যাদের বাপ–মা জান্নাতী হবে না। কাজেই তাদের ব্যাপারে একথা যুক্তিসংগত মনে হয় যে, তাদেরকে জান্নাতবাসীদের খাদেম বানিয়ে দেয়া হবে। (এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনার জন্য "ফাত্‌হুল বারী" ও "উম্‌দাতুল কারী"র জানায়েয অধ্যায়ের 'মুশরিকদের সন্তানদের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে' অনুচ্ছেদে, "রাসায়েল ও মাসায়েল" ৩ খন্ড ১৭৭–১৮৭ পৃষ্ঠা দেখুন।)

২৭. অর্থাৎ দুনিয়ার শরাবে যে দু'ধরনের দোষ থাকে তা হবে তার স্পর্শ মুক্ত। দুনিয়ার শরাবের এক ধরনের দোষ হচ্ছে, মানুষ তার কাছে আসতেই প্রথমে তার পচা দুর্গন্ধ নাকে

فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿٥٠﴾ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّىْ كَانَ لِىْ قَرِيْنٌ ﴿٥١﴾ يَّقُوْلُ اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ ﴿٥٢﴾ ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ ﴿٥٣﴾ قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ ﴿٥٤﴾ فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِىْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ﴿٥٥﴾

*তারপর তারা একজন অন্যজনের দিকে ফিরে অবস্থা জিজ্ঞেস করবে। তাদের একজন বলবে, "দুনিয়ায় আমার ছিল এক সংগী, সে আমাকে বলতো, তুমিও কি সত্য বলে মেনে নেবার দলে?[৩১] যখন আমরা মরে যাবো, মাটির সাথে মিশে যাবো এবং অস্থি পিঞ্জরই থেকে যাবে তখন সত্যিই কি আমাদের শাস্তি ও পুরস্কার দেয়া হবে? তোমরা কি দেখতে চাও সে এখন কোথায় আছে?" এ বলে যেমনি সে নিচের দিকে ঝুঁকবে তখনই দেখবে তাকে জাহান্নামের অতল গভীরে।*

পৌঁছে যায়। তারপর তার স্বাদ মানুষের জিহ্বাকে তিক্ত ও বিস্বাদ করে দেয়। এরপর গলার নিচে নামার সাথে সাথেই তা পেট চেপে ধরে। তারপর তা মাথায় চড়তে থাকে এবং মাথায় চক্কর দিতে থাকে। এরপর তা যকৃত বা কলিজাকে প্রভাবিত করে এবং মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর তার খারাপ প্রভাব পড়তে থাকে। তারপর যখন নেশা খতম হয়ে যেতে থাকে তখন মানুষ নিদ্রালুতা ও অবসাদে আক্রান্ত হয়। এসব হচ্ছে শারীরিক ক্ষতি। দ্বিতীয় ধরনের দোষ হচ্ছে, শরাব পান করে মানুষ বকবক করতে থাকে, উল্টা পাল্টা আজে-বাজে অর্থহীন কথা বলতে থাকে, এগুলো শরাবের মানসিক ক্ষতি। দুনিয়ায় মানুষ কেবলমাত্র আনন্দ লাভের জন্য এ সমস্ত ক্ষতি বরদাশ্‌ত করে। আল্লাহ বলেন, জান্নাতের শরাবে আনন্দলাভ করা যাবে পূর্ণভাবে (لَذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ) কিন্তু উপরোক্ত দু'ধরনের ক্ষতির কোনটারই সম্ভাবনা সেখানে থাকবে না।

২৮. অর্থাৎ নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য কারো প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না।

২৯. সম্ভবত এরা সেসব মেয়ে হবে যারা প্রাপ্ত বয়স্কা হবার আগেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে এবং যাদের পিতামাতা জান্নাতলাভের অধিকারী হয়নি। অনুমানের ভিত্তিতে একথা বলা যেতে পারে যে, এ ধরনের ছেলেদেরকে যেমন জান্নাতবাসীদের সেবায় নিযুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা হামেশা বালকই থাকবে ঠিক তেমনি এ ধরনের মেয়েদেরকে জান্নাতবাসীদের জন্য হূরে পরিণত করা হবে এবং তারা চিরকাল উঠতি বালিকাই থাকবে। অবশ্য এ ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন।

৩০. মূলে বলা হয়েছে كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ "যেন তারা গোপন বা সংরক্ষিত ডিম" তাফসীর বিশারদগণ এ শব্দগুলোর বিভিন্ন ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। কিন্তু সঠিক ব্যাখ্যা সেটিই যেটি হযরত উম্মে সালামাহ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

قَالَ تَاللّٰهِ إِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ ﴿٥٦﴾ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّيْ لَكُنْتُ مِنَ
الْمُحْضَرِيْنَ ﴿٥٧﴾ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ ﴿٥٨﴾ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُوْلٰى وَمَا نَحْنُ
بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿٥٩﴾ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٠﴾ لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ ﴿٦١﴾
أَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ ﴿٦٢﴾ إِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ ﴿٦٣﴾
إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْٓ أَصْلِ الْجَحِيْمِ ﴿٦٤﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوْسُ
الشَّيٰطِيْنِ ﴿٦٥﴾ فَإِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ﴿٦٦﴾

*এবং তাকে সম্বোধন করে বলতে থাকবে, "আল্লাহর কসম, তুই তো আমাকে ধ্বংসই করে দিতে চাচ্ছিলি। আমার রবের মেহেরবাণী না হলে আজ আমিও যারা পাকড়াও হয়ে এসেছে তাদের অন্তরভুক্ত হতাম।[৩২] আচ্ছা, তাহলে কি এখন আমরা আর মরবো না? আমাদের যে মৃত্যু হবার ছিল তা প্রথমেই হয়ে গেছে? এখন আমাদের কোন শাস্তি হবে না?"[৩৩]*

*নিশ্চিতভাবেই এটিই মহান সাফল্য। এ ধরনের সাফল্যের জন্যই কাজ করতে হবে তাদের যারা কাজ করে। বলো, এ ভোজ ভালো, না যাক্কুম গাছ?[৩৪] আমি এ গাছটিকে জালেমদের জন্য ফিতনায় পরিণত করে দিয়েছি।[৩৫] সেটি একটি গাছ, যা বের হয় জাহান্নামের তলদেশ থেকে। তার ফুলের কলিগুলো যেন শয়তানদের মুণ্ডু।[৩৬] জাহান্নামের অধিবাসীরা তা খাবে এবং তা দিয়ে পেট ভরবে।*

থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন, আমি নবী করীমকে (সা) এ আয়াতটির অর্থ জিজ্ঞেস করি। জবাবে তিনি বলেন, তাদের কোমলতা ও নাজুকতা এমন ঝিল্লির মত হবে যা ডিমের খোসা ও তার সাদা অংশের মাঝখানে থাকে। (ইবনে জারীর)

৩১. অর্থাৎ তোমরাও কি এমন দুর্বল বিশ্বাসীদের দলে ভিড়লে যারা মৃত্যু পরবর্তী জীবনের মতো অযৌক্তিক কথা মেনে নিয়েছে?

৩২. এ থেকে অনুমান করা যায়, আখেরাতে মানুষের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও বাকশক্তি কোন্ ধরনের হবে। জান্নাতে বসে এক ব্যক্তি যখন চাইবে কোন টেলিভিশন যন্ত্রের সহায়তা ছাড়াই সামান্য একটু ঝুঁকে পড়ে এমন এক ব্যক্তিকে দেখে নেবে যে তার থেকে নাজানি কত হাজার মাইল ব্যবধানে জাহান্নামের আযাবের মধ্যে আছে। তারপর এখানেই শেষ নয়, তারা দু'জনই কেবল দু'জনকে দেখতে পাচ্ছে না বরং তাদের মধ্যে

ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٦٧﴾ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ﴿٦٨﴾
إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ﴿٦٩﴾ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿٧٠﴾ وَلَقَدْ ضَلَّ
قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧١﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ﴿٧٢﴾ فَانظُرْ كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٧٤﴾

*তারপর পান করার জন্য তারা পাবে ফুটন্ত পানি। আর এরপর তাদের প্রত্যাবর্তন হবে। এ অগ্নিময় দোজখের দিকে।*[৩৭] *এরা এমনসব লোক যারা নিজেদের বাপ–দাদাদেরকে পথভ্রষ্ট পেয়েছে এবং তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে ছুটে চলেছে।*[৩৮] *অথচ তাদের পূর্বে বহু লোক পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মধ্যে আমি সতর্ককারী রসূল পাঠিয়েছিলাম। এখন দেখো সে সতর্ককৃত লোকদের কি পরিণাম হয়েছিল। এ অশুভ পরিণতির হাত থেকে কেবলমাত্র আল্লাহর সে বান্দারাই রেহাই পেয়েছে যাদেরকে তিনি নিজের জন্য স্বতন্ত্র করে নিয়েছেন।*

কোন টেলিফোন বা রেডিও যোগাযোগ ছাড়াই তারা সরাসরি কথার আদান প্রদানও করছে। এত দূরের ব্যবধান থেকে তারা কথা বলবে এবং পরস্পরের কথা শুনবে।

৩৩. বর্ণনাভংগী পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, নিজের জাহান্নামী বন্ধুর সাথে কথা বলতে বলতে হঠাৎ এ জান্নাতী লোকটি তার নিজের সাথে কথা বলতে থাকবে এবং এ তিনটি বাক্য তার মুখ থেকে এমনভাবে বের হবে যেন কোন ব্যক্তি নিজেকে সব ধরনের প্রত্যাশা ও অনুমানের উর্ধের অবস্থায় পেয়ে চরম বিস্ময় ও আনন্দ বিহ্বলতার মধ্যে স্বতস্ফূর্তভাবে বলে যাচ্ছে। এ ধরনের কথায় কোন বিশেষ ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয় না এবং এখানে মানুষ যে প্রশ্ন করে তার উদ্দেশ্য আসলে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করা হয় না। বরং সেখানে মানুষের নিজের মনের অনুভূতি প্রকাশ ঘটে তার নিজের ভাষায়। এ জান্নাতী লোকটি জাহান্নামী লোকটির সাথে কথা বলতে বলতে সহসা অনুভব করতে থাকবে যে, তার সৌভাগ্য তাকে কোথায় নিয়ে এসেছে। এখন মৃত্যুও নেই, শাস্তিও নেই। সমস্ত কষ্টের অবসান ঘটেছে এবং সে এখন চিরন্তন জীবনের অধিকারী হয়েছে। এ অনুভূতির ভিত্তিতে সে স্বতস্ফূর্তভাবে বলে ওঠে, আমি এখন এ মর্যাদায় উপনীত হয়েছি?

৩৪. যাক্কুম এক ধরনের গাছ। তিহামা এলাকায় এ গাছ দেখা যায়। এর স্বাদ হয় তিতা, গন্ধ বিরক্তিকর এবং ভাঙলে এর মধ্য থেকে এক ধরনের দুধের মতো পদার্থ বের হয় যা গায়ে লাগলে গা ফুলে ওঠে ও ফোস্কা পড়ে।

وَلَقَدْ نَادٰىنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ﴿٧٥﴾ وَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٦﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ ﴿٧٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ﴿٧٨﴾ سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٩﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٠﴾ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨١﴾ ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿٨٢﴾

৩ রুকূ'

*(ইতিপূর্বে)৩৯ নূহ আমাকে ডেকেছিল,৪০ তাহলে দেখো, আমি ছিলাম কত ভালো জওয়াবদাতা। আমি তাকে ও তার পরিবারবর্গকে উদ্ধার করি ভয়াবহ যন্ত্রণা থেকে,৪১ শুধু তার বংশধরদেরকেই টিকিয়ে রাখি৪২ এবং পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে তারই প্রশংসা ছেড়ে দেই। সমগ্র বিশ্ববাসীর মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।৪৩ সৎকর্মশীলদেরকে আমি এমনই প্রতিদান দিয়ে থাকি। আসলে সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্তরভুক্ত। তারপর অন্যদলকে আমি ডুবিয়ে দেই।*

৩৫. অর্থাৎ অস্বীকারকারীরা একথা শুনে কুরআনের নিন্দা ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিদ্রূপ করার একটি নতুন সুযোগ পেয়ে যায়। এর ফলে তারা ঠাট্টা করে বলতে থাকে, নাও এখন নতুন কথা শোনো, জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে নাকি আবার গাছ জন্মাবে।

৩৬. এখানে এরূপ ভুল বুঝাবুঝি হওয়া চাই না যে, শয়তানের মাথা কে দেখেছে যে যাক্কুম গাছের ফুলকে তার সাথে তুলনা করা হয়েছে? আসলে এটি একটি কাল্পনিক উপমা। সাধারণভাবে প্রত্যেক ভাষার সাহিত্যে এর সাহায্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যেমন আমরা একটি মেয়ের পরমা সুন্দরী হবার ধারণা প্রকাশ করার জন্য বলি, বাহ্‌ মেয়েটি পরীর মতো সুন্দরী। অন্যদিকে কোন মেয়ের চরম কদাকার রূপ বর্ণনা করার জন্য বলি, মেয়েটি যেন একটি পেত্নী। কোন ব্যক্তির নূরানী চেহারার বর্ণনা দেবার জন্য বলে থাকি, ঠিক ফেরেশ্‌তার মতো চেহারা। আর কেউ যদি অত্যন্ত ভয়াল ভীষণ আকৃতি নিয়ে সামনে আসে তাহলে আমরা বলি, তাকে ঠিক শয়তানের মতো দেখাচ্ছে।

৩৭. এ থেকে বুঝা যায় যে, জাহান্নামবাসীরা যখন ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হয়ে যেতে থাকবে তখন তাদেরকে হাঁকিয়ে এমন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে যেখানে রয়েছে যাক্কুম গাছ ও টগবগে ফুটন্ত পানির ঝরণা। তারপর সেখান থেকে খানাপিনা শেষ করার পর তাদেরকে আবার তাদের জাহান্নামে ফিরিয়ে আনা হবে।

৩৮. অর্থাৎ তারা নিজেদের বুদ্ধি ব্যবহার করে তাদের বাপ-দাদাদের থেকে যে রীতি-রেওয়াজ চলে আসছে তা সঠিক কিনা সেকথা কোনদিন চিন্তা করেনি। ব্যাস, যে পথে অন্যদেরকে চলতে দেখেছে চোখ বন্ধ করে তারা সে পথেই চলতে থেকেছে।

وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِۦ لَإِبْرَٰهِيمَ ﴿٨٣﴾ إِذْ جَآءَ رَبَّهُۥ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿٨٥﴾ أَئِفْكًا ءَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٨٦﴾ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٧﴾

*আর নূহের পথের অনুসারী ছিল ইবরাহীম। যখন সে তার রবের সামনে হাজির হয় "বিশুদ্ধ চিত্ত" নিয়ে।[৪৪] যখন বলে সে তার পিতা ও তার জাতিকে[৪৫] "এগুলো কি জিনিস যার ইবাদাত তোমরা করছো? আল্লাহকে বাদ দিয়ে কি তোমরা মিথ্যা বানোয়াট মাবুদ চাও? সমস্ত বিশ্ব-জগতের রব আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি?"[৪৬]*

৩৯. এ বিষয়বস্তুটির সম্পর্ক রয়েছে পেছনের রুকূ'র শেষ বাক্যগুলোর সাথে। সেগুলোর ওপর চিন্তা-ভাবনা করলে এ কাহিনীটি এখানে কেন শুনানো হচ্ছে তা বুঝা যায়।

৪০. এখানে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের ফরিয়াদের কথা বলা হয়েছে। দীর্ঘকাল নিজের কওমকে সত্য দীনের দাওয়াত দেবার পর শেষে হতাশ হয়ে তিনি মহান আল্লাহর কাছে এ ফরিয়াদ করেছিলেন। সূরা কামারে এ ফরিয়াদের শব্দগুলো নিম্নোক্তভাবে এসেছে فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَغْلُوبٌ فَٱنتَصِرْ "সে তার রবকে ডেকে বললো, আমি পরাজিত হয়ে গেছি, তুমি আমাকে সাহায্য করো।" (আল কামার, ১০ আয়াত)

৪১. অর্থাৎ একটি চরিত্রহীন ও জালেম জাতির ক্রমাগত বিরোধিতার কারণে তিনিই যে ভয়াবহ যন্ত্রণা, ক্লেশ ও কষ্টের সম্মুখীন হচ্ছিলেন। এর মধ্যে এ বিষয়টির প্রতিও একটি সূক্ষ্ম ইংগিত রয়েছে যে, নূহ আলাইহিস সালাম ও তাঁর সাথিদেরকে যেভাবে সেই মহাক্লেশ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, ঠিক তেমনি শেষ পর্যন্ত আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সংগী-সাথিদেরকেও মক্কাবাসীরা যে মহাক্লেশের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে তা থেকে উদ্ধার করবো।

৪২. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, যারা হযরত নূহের বিরোধিতা করছিল তাদের বংশধারা দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে এবং হযরত নূহেরই বংশধারাকে টিকিয়ে রাখা হয়েছে। দুই, সমস্ত মানব বংশধারাকে খতম করে দেয়া হয়েছে এবং সামনের দিকে কেবলমাত্র নূহ আলাইহিস সালামের সন্তানদের মাধ্যমে এ দুনিয়ার জনবসতিকে বিস্তৃতি দান করা হয়েছে। সাধারণভাবে মুফাস্সিরগণ এ দ্বিতীয় অর্থটিই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কুরআন মজীদের শব্দাবলী এ অর্থটির ব্যাপারে সুস্পষ্ট নয়। আসল ব্যাপারটা কি তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

৪৩. অর্থাৎ আজ সারা দুনিয়ায় হযরত নূহের দুর্নাম করার কেউ নেই। নূহের প্লাবনের পর থেকে আজ পর্যন্ত হাজার হাজার বছর ধরে দনিয়াবাসীরা তাঁর সুনামই করে চলছে।

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٨٨﴾ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٩٠﴾ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ ﴿٩٢﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿٩٣﴾

*তারপর[৪৭] সে তারকাদের দিকে একবার তাকালো[৪৮] এবং বললো, আমি অসুস্থ।[৪৯] কাজেই তারা তাকে ত্যাগ করে চলে গেলো।[৫০] তাদের পেছনে সে চুপিচুপি তাদের দেবতাদের মন্দিরে ঢুকে পড়লো এবং বললো, "আপনারা খাচ্ছেন না কেন?"[৫১] কি হলো আপনাদের, কথা বলছেন না কেন?" এরপর সে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং ডান হাত দিয়ে খুব আঘাত করলো।*

৪৪. রবের সামনে হাজির হওয়ার অর্থ হচ্ছে, তাঁর দিকে রুজু হওয়া এবং সবার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একমাত্র তাঁর দিকে মুখ করা। আর বিশুদ্ধ চিত্ত (قلب سليم) মানে হচ্ছে "সঠিক ও নিষ্কলুষ অন্তকরণ"। অর্থাৎ সব রকমের বিশ্বাসগত ও নৈতিক ত্রুটিমুক্ত অন্তর। যেখানে কুফরী ও শিরক এবং সন্দেহ-সংশয়ের লেশ মাত্রও নেই। যার মধ্যে নাফরমানী ও বিদ্রোহের কোন সামান্যতম অনুভূতিও পাওয়া যায় না। যার মধ্যে কোন প্রকার প্যাঁচ ও জটিলতা নেই। যা সব ধরনের অসৎ প্রবণতা ও অপবিত্র কামনা-বাসনার সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত। যার মধ্যে কারো বিরুদ্ধে হিংসা, বিদ্বেষ ও অকল্যাণ কামনা পাওয়া যায় না এবং যার নিয়তে কোনপ্রকার ত্রুটি ও কৃত্রিমতা নেই।

৪৫. হযরত ইবরাহীমের (আ) এ ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল আন'আম, ৫০-৫৫; মারয়াম, ২৬-২৭; আল আম্বিয়া, ৫১-৬৬ ; আশ্ শূ'আরা, ৫০-৬৪ এবং আল 'আনকাবূত, ২৫-৪৮ টীকা।

৪৬. অর্থাৎ আল্লাহকে তোমরা কী মনে করেছো? তোমরা কি মনে করো, এসব কাঠ-পাথরের তৈরি দেবতারা তাঁর সমজাতীয় হতে পারে? অথবা এরা তাঁর গুণাবলী ও ক্ষমতায় শরীক হতে পারে? আর তোমরা কি এ বিভ্রান্ত চিন্তারও শিকার হয়েছো যে, তাঁর সাথে এত বড় গোস্তাখী করার পর তোমরা তাঁর পাকড়াও থেকে রেহাই পেয়ে যাবে?

৪৭. এখন একটি বিশেষ ঘটনার কথা বলা হচ্ছে। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা এসেছে সূরা আল আম্বিয়া, ৫১-৭৩ এবং আল 'আনকাবূতে, ১৬-২৭ আয়াতে।

৪৮. ইবনে আবি হাতেম প্রসিদ্ধ তাবে'ঈ মুফাস্‌সির কাতাদাহর এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, আরবরা نَظَرَ فِى النُّجُوم (সে তারকাদের দিকে তাকালো) শব্দাবলী প্রবাদ বাক্য হিসেবে ব্যবহার করে তার যে অর্থ গ্রহণ করে তা হচ্ছে এই যে, সে ভাবনা-চিন্তা করলো অথবা সে চিন্তা করতে লাগলো। আল্লামা ইবনে কাসীর এ উক্তিটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এমনিতেও প্রায়ই দেখা যায়, যখন কোন ব্যক্তির সামনে চিন্তার কোন বিষয় আসে তখন সে আকাশের দিকে অথবা ওপরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে তারপর ভেবে-চিন্তে জবাব দেয়।

فَأَقْبَلُوْٓا إِلَيْهِ يَزِفُّوْنَ (৯৪) قَالَ أَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ (৯৫) وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ (৯৬) قَالُوا ابْنُوْا لَهٗ بُنْيَانًا فَأَلْقُوْهُ فِي الْجَحِيْمِ (৯৭) فَأَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْأَسْفَلِيْنَ (৯৮) وَقَالَ إِنِّيْ ذَاهِبٌ إِلٰى رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ (৯৯) رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ (১০০)

*(ফিরে এসে) তারা দৌড়ে তার কাছে এলো।[৫২] সে বললো, "তোমরা কি নিজেদেরই খোদাই করা জিনিসের পূজা করো? অথচ আল্লাহই তোমাদেরকেও সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যে জিনিসগুলো তৈরি করো তাদেরকেও।" তারা পরস্পর বললো, "এর জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড তৈরি করো এবং একে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ফেলে দাও।" তারা তার বিরুদ্ধে একটি পদক্ষেপ নিতে চেয়েছিল কিন্তু আমি তাদেরকে হেয়প্রতিপন্ন করেছি।[৫৩]*

*ইবরাহীম বললো,[৫৪] "আমি আমার রবের দিকে যাচ্ছি,[৫৫] তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন। হে পরওয়ারদিগার! আমাকে একটি সৎকর্মশীল পুত্র সন্তান দাও।"[৫৬]*

৪৯. হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর জীবনে তিনটে মিথ্যা বলেছিলেন বলে যে কথা বলা হয়ে থাকে এটি তার একটি। অথচ একথাটিকে মিথ্যা বা বাস্তব বিরোধী বলার জন্য প্রথমে কোন উপায়ে একথা জানা উচিত যে, সে সময় হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কোন প্রকারের কোন কষ্ট ও অসুস্থতা ছিল না এবং তিনি নিছক বাহানা করে একথা বলেছিলেন। যদি এর কোন প্রমাণ না থেকে থাকে, তাহলে অযথা কিসের ভিত্তিতে একে মিথ্যা গণ্য করা হবে? এ বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমি তাফহীমুল কুরআন সূরা আল আম্বিয়া, ৬০ টীকায় করেছি এবং আরো কিছু আলোচনা রাসায়েল ও মাসায়েল ২ খণ্ডের ২০–২৪ পৃষ্ঠায় এসে গেছে।

৫০. আসল ব্যাপার কি ছিল তা এ বাক্য নিজেই প্রকাশ করছে। মনে হচ্ছে সম্প্রদায়ের লোকেরা কোন জাতীয় মেলায় যাচ্ছিল। হযরত ইবরাহীমের পরিবারের লোকেরা তাঁকেও সংগে যেতে অনুরোধ করে থাকবে। তিনি আমার শরীর খারাপ, আমি যেতে পারবো না, বলে ওযর পেশ করে দিয়ে থাকবেন। এখন যদি একথাটা একেবারে অসত্য বা বাস্তব বিরোধী হতো, তাহলে ঘরের লোকেরা তাঁকে বলতো, শরীর–স্বাস্থ্য তো ভালোই আছে দেখতে পাচ্ছি, তাহলে আবার খামখা বাহানা করছো কেন? কিন্তু যখন তারা এ ওজর গ্রহণ করে তাঁকে পেছনে রেখে চলে গেলো তখন এ থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে একথা প্রকাশ পায় যে, নিশ্চয়ই হযরত ইবরাহীম সে সময় সর্দি, কাশি অথবা এ ধরনের কোন সাধারণ রোগে ভুগছিলেন, যার ফলে পরিবারের লোকেরা তাঁকে রেখে চলে যেতে রাজি হয়ে যায়।

৫১. এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, মন্দিরে মূর্তিদের সামনে বিভিন্ন প্রকার খাবার জিনিস রাখা হয়েছিল।

৫২. এখানে ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। সূরা আল আম্বিয়ায় এর যে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে তাতে বলা হয়েছে, যখন তারা ফিরে এসে তাদের মন্দিরে সমস্ত মূর্তি ভেঙে পড়ে আছে দেখলো তখন চারদিকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলো। কিছু লোক বললো, ইবরাহীম নামের এক যুবক মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে নানান কথা বলে বেড়ায়। একথায় জমায়েতের লোকেরা বললো তাকে ধরে আনো। সে অনুসারে একটি দল দৌড়ে তাঁর কাছে এলো এবং তাঁকে সমবেত জনতার সামনে হাজির করলো।

৫৩. সূরা আল আম্বিয়ার ৬৯ আয়াতের শব্দাবলী হচ্ছে ঃ

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ

"আমি বললাম, হে আগুন! শীতল হয়ে যাও এবং নিরাপদ হয়ে যাও ইবরাহীমের জন্য।"

সূরা আল আনকাবূতের ২৪ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ فَاَنْجٰهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ (তারপর আল্লাহ থাকে আগুন থেকে উদ্ধার করলেন) এ থেকে প্রমাণ হয়, তারা হযরত ইবরাহীমকে (আ) আগুনে নিক্ষেপ করেছিল এবং তারপর আল্লাহ তাঁকে তা থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করেন। "তারা তাঁর বিরুদ্ধে একটি পদক্ষেপ নিতে চাচ্ছিল কিন্তু আমি তাদেরকে হেয়প্রতিপন্ন করেছি" আয়াতের এ শব্দগুলোকে এ অর্থে গ্রহণ করা যেতে পারে না যে, তারা হযরত ইবরাহীমকে আগুনে নিক্ষেপ করতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। বরং ওপরে উল্লেখিত আয়াতের সাথে মিলিয়ে দেখলে তার এ অর্থটিই পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, তারা তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করে মেরে ফেলতে চাচ্ছিল কিন্তু তা করতে পারেনি। অলৌকিকভাবে বেঁচে যাবার ফলে হযরত ইবরাহীমের (আ) শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয়ে গেলো এবং মুশরিকদেরকে আল্লাহ হেয়প্রতিপন্ন করলেন। এ ঘটনাটি বর্ণনা করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরাইশদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া যে, তোমরা যে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সন্তান হবার গর্ব করে থাকো তাঁর নীতি তা ছিল না যা তোমরা অবলম্বন করেছো বরং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম যে নীতি অবলম্বন করেছেন সেটিই ছিল তাঁর নীতি। এখন যদি তোমরা তাঁকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য এমন ধরনের চক্রান্ত করো যা হযরত ইবরাহীমের জাতি তাঁর বিরুদ্ধে করেছিল, তাহলে শেষ পর্যন্ত তোমরাই হেয়প্রতিপন্ন হবে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হেয়-প্রতিপন্ন করার ক্ষমতা তোমাদের নেই।

৫৪. আগুন থেকে সুস্থ শরীরে স্বাচ্ছন্দে বেরিয়ে আসার পর যখন হযরত ইবরাহীম (আ) দেশ থেকে বের হয়ে যাবার ফায়সালা করলেন তখন চলার সময় একথাগুলো বলেন।

৫৫. এর অর্থ হচ্ছে, আমি আল্লাহর জন্য বের হয়ে পড়ছি। কারণ আমি আল্লাহর হয়ে গেছি, তাই আমার জাতি আমার শত্রু হয়ে গেছে। নয়তো আমার ও তার মধ্যে কোন দুনিয়াবী ঝগড়া ছিল না এবং এর ভিত্তিতে আমাকে স্বদেশ ত্যাগ করতে হচ্ছে না। তাছাড়া

فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ۚ قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾ فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ﴿١٠٣﴾ وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ ﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٠٥﴾ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ ﴿١٠٦﴾

*(এ দোয়ার জবাবে) আমি তাকে একটি ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।[৫৭] সে পুত্র যখন তার সাথে কাজকর্ম করার বয়সে পৌঁছুলো তখন (একদিন) ইবরাহীম তাকে বললো, "হে পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখি তোমাকে আমি যবেহ করছি,[৫৮] এখন তুমি বল তুমি কি মনে কর?"[৫৯] সে বললো, "হে আব্বাজান! আপনাকে যা হুকুম দেয়া হচ্ছে[৬০] তা করে ফেলুন, আপনি আমাকে ইনশাআল্লাহ সবরকারীই পাবেন।" শেষ পর্যন্ত যখন এরা দু'জন আনুগত্যের শির নত করে দিল এবং ইবরাহীম পুত্রকে উপুড় করে শুইয়ে দিল[৬১] এবং আমি আওয়াজ দিলাম,[৬২] "হে ইবরাহীম! তুমি স্বপ্নকে সত্য করে দেখিয়ে দিয়েছো।[৬৩] আমি সৎকর্মকারীদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি[৬৪] নিশ্চিতভাবেই এটি ছিল একটি প্রকাশ্য পরীক্ষা।"[৬৫]*

দুনিয়ায় আমার যাবার মতো কোন ঠিকানা নেই। সমগ্র দেহ-প্রাণকে তাকদীরের হাতে ছেড়ে দিয়ে একমাত্র আল্লাহর ভরসায় বের হয়ে পড়ছি। যেদিকে তিনি নিয়ে যাবেন সেদিকেই চলে যাবো।

৫৬. এ দোয়া থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে একথা জানা যায় যে, হযরত ইবরাহীম সে সময় সন্তানহীন ছিলেন। কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে যে অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে জানা যায়, তিনি কেবলমাত্র নিজের এক স্ত্রী ও এক ভাতিজাকে (হযরত লূত) সাথে নিয়ে দেশ থেকে বের হয়ে পড়েছিলেন। সে সময় স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মনে এ কামনার উদ্ভব হয়ে থাকবে যে, আল্লাহ যেন তাঁকে একটি সৎকর্মশীল সন্তান দান করেন, যে এ প্রবাস জীবনে তাঁর দুঃখ লাঘব করতে সাহায্য করবে।

৫৭. দোয়া করতে করতেই সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, এ থেকে একথা মনে করার কোন কারণ নেই। কুরআন মজীদেরই অন্য স্থানে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের এ উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لِىْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ

"আল্লাহর শোকর, তিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে ইসমাঈল ও ইসহাক দান করেছেন।"
(ইবরাহীম, ৩৯)

এ থেকে প্রমাণ হয়, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দোয়া এবং এ সুসংবাদের মধ্যে বহু বছরের ব্যবধান ছিল। বাইবেল বর্ণনা করছে, হযরত ইসমাঈলের (আ) জন্মের সময় হযরত ইবরাহীমের (আ) বয়স ছিল ৮৬ বছর। (আদি পুস্তক ১৬ ঃ ১৬) অন্যদিকে হযরত ইসহাকের জন্মের সময় তাঁর বয়স ছিল একশত বছর (৫ ঃ ২১)

৫৮. একথা মনে রাখতে হবে, হযরত ইবরাহীম (আ) স্বপ্নে দেখেননি যে, তিনি পুত্রকে যবেহ করে ফেলেছেন। বরং তিনি দেখেছিলেন, তিনি তাকে যবেহ করছেন। যদিও তিনি তখন স্বপ্নের এ অর্থই নিয়েছিলেন যে, তিনি পুত্রকে যবেহ করবেন। এ কারণে তিনি ঠাণ্ডা মাথায় পুত্রকে কুরবানী করে দেবার জন্য একেবারেই তৈরি হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু স্বপ্ন দেখাবার মধ্যে মহান আল্লাহ যে সূক্ষ্ম বিষয় সামনে রেখেছিলেন তা সামনের ১০৫ আয়াতে তিনি নিজেই সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন।

৫৯. পুত্রকে একথা জিজ্ঞেস করার এ অর্থ ছিল না যে, তুমি রাজি হয়ে গেলে আল্লাহর হুকুম তামিল করবো অন্যথায় করবো না। বরং হযরত ইবরাহীম আসলে দেখতে চাচ্ছিলেন, তিনি যে সৎসন্তানের জন্য দোয়া করেছিলেন সে যথার্থই কতটুকু সৎ। যদি সে নিজে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের লক্ষে প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকে, তাহলে এর অর্থ হয়, দোয়া পুরোপুরি কবুল হয়েছে এবং পুত্র নিছক শারীরিক দিক দিয়েই তাঁর সন্তান নয় বরং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও তাঁর সুসন্তান।

৬০. এ শব্দগুলো পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে, নবী-পিতার স্বপ্নকে পুত্র নিছক স্বপ্ন নয় বরং আল্লাহর হুকুম মনে করেছিলেন। এখন যদি যথার্থই এটি আল্লাহর হুকুম না হতো তাহলে অবশ্যই আল্লাহ পরিষ্কারভাবে বা ইংগিতের মাধ্যমে বলে দিতেন যে, ইবরাহীম-পুত্র ভুলে একে হুকুম মনে করে নিয়েছে। কিন্তু পূর্বাপর আলোচনায় এর কোন ইংগিত নেই। এ কারণে নবীদের স্বপ্ন নিছক স্বপ্ন নয় বরং তাও হয় এক ধরনের অহী, মুসলমানরা এ বিশ্বাস পোষণ করে। একথা সুস্পষ্ট, যে কথার মাধ্যমে এতবড় একটি নিয়ম আল্লাহর শরীয়াতের অন্তরভুক্ত হতে পারে তা যদি সত্য ভিত্তিক না হতো বরং নিছক একটি বিভ্রান্তি হতো তাহলে আল্লাহ তার প্রতিবাদ করতেন না, এটা হতো একটি অসম্ভব ব্যাপার। কুরআনকে যারা আল্লাহর কালাম বলে মানে তাদের পক্ষে আল্লাহর এ ধরনের ভুল হয়ে যেতে পারে একথা মেনে নেয়া একেবারেই অসম্ভব।

৬১. অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ) যবেহ করার জন্য পুত্রকে চিৎ করে শোয়াননি বরং উপুড় করে শুইয়ে দিয়েছেন, যাতে যবেহ করার সময় পুত্রের মুখ দেখে কোন প্রকার স্নেহ-মমতার বসে তাঁর হাত কেঁপে না যায়। তাই তিনি নিচের দিক থেকে হাত রেখে ছুরি চালাতে চাচ্ছিলেন।

৬২. ব্যাকরণবিদদের একটি দল বলেন, এখানে "এবং" শব্দটি "তখন" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ বাক্যটি হবে—"যখন এরা দু'জন আনুগত্যের শির নত করে দিল এবং ইবরাহীম পুত্রকে উপুড় করে শুইয়ে দিল তখন আমি আওয়াজ দিলাম।" কিন্তু অন্য একটি দল বলেন, এখানে "যখন" শব্দটির জওয়াব উহ্য রয়ে গেছে এবং তাকে শ্রোতার মনের

وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ﴿١٠٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٠٨﴾ سَلٰمٌ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ﴿١٠٩﴾
كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١١٠﴾ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١١﴾ وَبَشَّرْنٰهُ
بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١١٢﴾ وَبٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اِسْحٰقَ ؕ وَمِنْ
ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ ﴿١١٣﴾

*একটি বড় কুরবানীর বিনিময়ে আমি এ শিশুটিকে ছাড়িয়ে নিলাম[৬৬] এবং পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে চিরকালের জন্য তার প্রশংসা রেখে দিলাম। শান্তি বর্ষিত হোক ইব্‌রাহীমের প্রতি। আমি সৎকর্মকারীদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চিতভাবেই সে ছিল আমার মুসলিম বান্দাদের অন্তরভুক্ত। আর আমি তাকে ইসহাকের সুসংবাদ দিলাম, সে ছিল সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে একজন নবী। আর বরকত দিলাম তাকে ও ইসহাককে,[৬৭] এখন এ দু'জনের বংশধরদের মধ্য থেকে কতক সৎকর্মকারী আবার কতক নিজেদের প্রতি সুস্পষ্ট জুলুমকারী।[৬৮]*

কল্পনার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কারণ কথা এত বড় ছিল যে, তাকে শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করার পরিবর্তে কল্পনারই জন্য ছেড়ে দেয়া বেশী সংগত ছিল। আল্লাহ যখন দেখে থাকবেন বুড়ো বাপ তার বুড়ো বয়সের আকাংখায় চেয়ে পাওয়া পুত্রকে নিছক তাঁর সন্তুষ্টিলাভের জন্য কুরবানী করে দিতে প্রস্তুত হয়ে গেছেন এবং পুত্রও নিজের গলায় ছুরি চালিয়ে দিতে রাজি হয়ে গেছে, তখন এ দৃশ্য দেখে রহমতের দরিয়া কেমন নাজানি উথলে উঠে থাকবে এবং দুই পিতা–পুত্রের প্রতি মালিকের প্রেম কেমন নাজানি বাঁধনহারা হয়ে গিয়ে থাকবে, তা কেবল কল্পনাই করা যেতে পারে। কথায় তার অবস্থা যতই বর্ণনা করা হোক না কেন তা ব্যক্ত করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। বরং বর্ণনায় তার আসল দৃশ্যের অতি অল্পই ফুটে উঠবে।

৬৩. অর্থাৎ তুমি পুত্রকে যবেহ করে দিয়েছো এবং তার প্রাণবায়ু বের হয়ে গেছে, এটা তো আমি তোমাকে দেখাইনি। বরং আমি দেখিয়েছিলাম, তুমি যবেহ করছো। তুমি সে স্বপ্নকে সত্য করে দেখিয়ে দিলে। কাজেই এখন তোমার সন্তানের প্রাণবায়ু বের করে নেয়া আমার লক্ষ নয়। আসল উদ্দেশ্য যা কিছু ছিল তা তোমার সংকল্প, উদ্যোগ ও প্রস্তুতিতেই সফল হয়ে গেছে।

৬৪. অর্থাৎ যারা সৎকর্মের পথ অবলম্বন করে তাদেরকে আমি খামখা কষ্টের মধ্যে ফেলে দেবার এবং দুঃখ ও ক্লেশের মুখোমুখি করার জন্য পরীক্ষার সম্মুখীন করি না। বরং তাদের উন্নত গুণাবলী বিকশিত করার এবং তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করার জন্যই তাদেরকে পরীক্ষার মুখোমুখি করি। তারপর পরীক্ষার খাতিরে তাদেরকে যে সংকট

সাগরে নিক্ষেপ করি তা থেকে নিরাপদে উদ্ধারও করি। তাই দেখো, পুত্রের কুরবানীর জন্য তোমার উদ্যোগ প্রবণতা ও প্রস্তুতিই তোমাকে এমন মর্যাদা দানের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছে, যা আমার সন্তুষ্টিলাভের জন্য যথার্থই পুত্র উৎসর্গকারী লাভ করতে পারতো। এভাবে আমি তোমার পুত্রের প্রাণও রক্ষা করলাম এবং তোমাকে এ উচ্চ মর্যাদাও দান করলাম।

৬৫. অর্থাৎ তোমার হাতে তোমার পুত্রকে যবেহ করা উদ্দেশ্য ছিল না। বরং দুনিয়ার কোন জিনিসকে তুমি আমার মোকাবিলায় বেশী প্রিয় মনে করো কিনা, সে পরীক্ষা নেয়াই ছিল আসল উদ্দেশ্য।

৬৬. "বড় কুরবানী" বলতে বাইবেল ও ইসলামী বর্ণনা অনুসারে একটি ভেড়া। সে সময় আল্লাহর ফেরেশ্‌তা হযরত ইবরাহীমের সামনে এটি পেশ করেন পুত্রের পরিবর্তে একে যবেহ করার জন্য। একে "বড় কুরবানী" বলার কারণ হচ্ছে এই যে, এটি ইবরাহীমের ন্যায় আল্লাহর বিশ্বস্ত বান্দার জন্য ইবরাহীম পুত্রের ন্যায় ধৈর্যশীল ও প্রাণ উৎসর্গকারী পুত্রের প্রাণের বিনিময়ে ছিল এবং আল্লাহ একে একটি নজীর বিহীন কুরবানীর নিয়ত পুরা করার অসিলায় পরিণত করেছিলেন। এ ছাড়াও একে "বড় কুরবানী" গণ্য করার আর একটি বড় কারণ দিয়েছেন যে, এ তারিখে সারা দুনিয়ার সমস্ত মু'মিন পশু কুরবানী করবে এবং বিশ্বস্ততা ও প্রাণ উৎসর্গীতার এ মহান ঘটনার স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত করতে থাকবে।

৬৭. এখানে এসে আমাদের সামনে এ প্রশ্ন দেখা দেয় যে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর যে পুত্রকে কুরবানী করতে উদ্যত হয়েছিলেন এবং যিনি স্বতস্ফূর্তভাবে নিজেকে এ কুরবানীর জন্য পেশ করে দিয়েছিলেন তিনি কে ছিলেন? সর্বপ্রথম এ প্রশ্নের জবাব আমাদের সামনে আসছে বাইবেল থেকে ঃ

> "ঈশ্বর আব্রাহামের পরীক্ষা করিলেন। তিনি তাঁহাকে কহিলেন, হে আব্রাহাম ............তুমি আপন পুত্রকে, তোমার অদ্বিতীয় পুত্রকে, যাহাকে তুমি ভালবাস, সেই ইস্‌হাককে লইয়া মোরিয়া দেশে যাও এবং তথাকার যে এক পর্বতের কথা আমি তোমাকে বলিব, তাহার উপরে তাহাকে হোমার্থে বলিদান কর।"
>
> (আদিপুস্তক ২২ ঃ ১-২)

এ বর্ণনায় একদিকে বলা হচ্ছে, আল্লাহ হযরত ইসহাকের কুরবানী চেয়েছিলেন আবার অন্যদিকে একথাও বলা হচ্ছে, তিনি একমাত্র পুত্র ছিলেন। অথচ বাইবেলের নিজেরই অন্যান্য বর্ণনা থেকে চূড়ান্তভাবে প্রমাণ হয় যে, হযরত ইসহাক একমাত্র পুত্র ছিলেন না। তাই বাইবেলের নিম্নোক্ত বিস্তারিত বক্তব্যটি একবার দেখুন ঃ

> "আব্রামের স্ত্রী সারী নিঃসন্তানা ছিলেন, এবং হাগার নামে তার এক মিস্রীয় দাসী ছিল। তাহাতে সারী আব্রামকে কহিলেন, দেখ সদাপ্রভূ আমাকে বন্ধ্যা করিয়াছেন; বিনয় করি, তুমি আমার দাসীর কাছে গমন কর, কি জানি ইহা দ্বারা আমি পুত্রবতী হইতে পারিব। তখন আব্রাম সারীর বাক্যে সম্মত হইলেন। এইরূপে কানান দেশে আব্রাম দশ বৎসর বাস করিলে পর আব্রামের স্ত্রী সারী আপন দাসী মিস্রীয়া হাগারকে লইয়া আপন স্বামী আব্রামের সহিত বিবাহ দিলেন। পরে আব্রাম হাগারের কাছে গমন করিলে সে গর্ভবতী হইল।" (আদি পুস্তক ১৬ ঃ ১-৪)

"সদাপ্রভূর দূত তাহাকে আরও কহিলেন, দেখ, তোমার গর্ভ হইয়াছে, তুমি পুত্র প্রসব করিবে, ও তাহার নাম ইশ্মায়েল [ঈশ্বর শুনেন] রাখিবে।" (আদিপুস্তক ১৬ ঃ ১১)

"আব্রামের ছেয়াশী বৎসর বয়সে হাগার আব্রামের নিমিত্তে ইশ্মায়েলকে প্রসব করিল।" (১৬ ঃ ১৬)

"আর ঈশ্বর আব্রাহামকে কহিলেন, তুমি তোমার স্ত্রী সারীকে আর সারী বলিয়া ডাকিওনা, তাহার নাম সারা [রানী] হইল.........তাহা হইতে এক পুত্রও তোমাকে দিব;.........তুমি তাহার নাম ইস্হাক [হাস্য] রাখিবে,......আগামী বৎসরের এই ঋতুতে সারা তোমার নিমিত্তে যাহাকে প্রসব করিবে, .......পরে আব্রাহাম আপনপুত্র ইশ্মায়েলকে ও .........গৃহে যত পুরুষ ছিল, সেই সকলকে লইয়া ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে সেই দিনে তাহাদের লিঙ্গাগ্রচর্ম ছেদন করিলেন। আব্রাহামের লিঙ্গাগ্রের ত্বক ছেদন কালে তাঁহার বয়স নিরানব্বই বৎসর। আর তাঁহার পুত্র ইশ্মায়েলের লিঙ্গাগ্রের ত্বক ছেদন কালে তাহার বয়স তের বৎসর।" (আদি পুস্তক ১৭ঃ ১৫-২৫)

"আব্রাহামের একশত বৎসর বয়সে তাঁহার পুত্র ইসহাকের জন্ম হয়।"

(আদিপুস্তক ২১ ঃ ৫)

এ থেকে বাইবেলের বর্ণনার বৈপরীত্য পরিষ্কার সামনে এসে যায়। একথা সুস্পষ্ট, ১৪ বছর পর্যন্ত হযরত ইসমাঈল (আ) হযরত ইবরাহীমের (আ) একমাত্র সন্তান ছিলেন। এখন যদি একমাত্র পুত্রের কুরবানী চাওয়া হয়ে থাকে তাহলে তা হযরত ইসহাকের নয় বরং ইসমাঈলের কুরবানী ছিল। কারণ তিনিই ছিলেন একমাত্র সন্তান। আর যদি হযরত ইসহাকের কুরবানী চাওয়া হয়ে থাকে তাহলে আবার একথা বলা ঠিক নয় যে, একমাত্র সন্তানের কুরবানী চাওয়া হয়েছিল।

এরপর আমরা ইসলামী বর্ণনাগুলোর প্রসংগে আসতে পারি। সেখানে দেখি ভীষণ মতবিরোধ। মুফাস্সিরগণ সাহাবা ও তাবেঈগণের যে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন তাতে একটি দলের উক্তি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ছিলেন হযরত ইবরাহীমের পুত্র হযরত ইসহাক। এ দলে রয়েছেন নিম্নোক্ত মনীষীগণ ঃ

হযরত উমর (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), হযরত আবু হুরাইরাহ (রা), কাতাদাহ, ইকরামাহ, হাসান বাসরী, সাঈদ ইবনে জুবাইর, মুজাহিদ, শা'বী, মাসরূক, মাকহূল, যুহরী, আতা, মুকাতিল, সুদ্দী, কা'ব আহবার, যায়েদ ইবনে আসলাম এবং আরো অনেকে।

দ্বিতীয় দলটি বলেন, তিনি ছিলেন হযরত ইসমাঈল। এ দলে রয়েছেন নিম্নোক্ত মনীষীগণ ঃ

হযরত আবুবকর (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), হযরত আবু হুরাইরাহ (রা), হযরত মু'আবীয়াহ (রা), ইকরামাহ, মুজাহিদ, ইউসুফ ইবনে মেহরান, হাসান বাসরী, মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল কুরযী, শা'বী, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, দ্বাহ্হাক, মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন

(মুহাম্মাদ আল বাকের), রাবী' ইবনে আনাস, আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং আরো অনেকে।

এ দু'টি তালিকা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এর মধ্যে অনেকগুলো নাম উভয় তালিকায় পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ একজন মনীষী বিভিন্ন সময় দু'টি ভিন্ন উক্তি করেছেন। যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে ইকরামাহ এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি ছিলেন হযরত ইবরাহীমের পুত্র হযরত ইসহাক। কিন্তু তাঁরই থেকে আতা ইবনে আবী রাবাহ একথা উদ্ধৃত করেছেন ঃ زعمت اليهود انه اسحق وكذبت اليهود (ইহুদীদের দাবী হচ্ছে, তিনি ছিলেন হযরত ইসহাক কিন্তু ইহুদীরা মিথ্যা বলেছে) অনুরূপভাবে হযরত হাসান বাসরী থেকে একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিনি হযরত ইসহাকের কুরবানীর প্রবক্তা ছিলেন। কিন্তু আমর ইবনে উবাইদ বলেন, হাসান বাসরীর এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না যে, হযরত ইবরাহীমের (আ) যে পুত্রকে যবেহ করার হুকুম হয়েছিল তিনি ছিলেন হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম।

এ বর্ণনার বিভিন্নতার ফলে মুসলিম আলেমগণের একটি দল পূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে হযরত ইসহাকের পক্ষে রায় দিয়েছেন। যেমন ইবনে জারীর ও কাযী ঈয়ায। অনেকে চূড়ান্তভাবে এ মত প্রকাশ করেছেন যে, হযরত ইসমাঈলকেই যবেহ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যেমন ইবনে কাসীর। আবার কেউ কেউ সংশয়াপন্ন। যেমন জালালুদ্দীন সুয়ূতী। কিন্তু গবেষণা ও অনুসন্ধানের দৃষ্টিতে বিচার করলে একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইসমাঈলকেই যবেহ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এর সপক্ষে নিম্নোক্ত যুক্তি রয়েছে ঃ

এক ঃ ওপরে কুরআন মজীদের এ বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে যে, স্বদেশ থেকে হিজরাত করার সময় হযরত ইবরাহীম (আ) একটি সৎকর্মশীল পুত্রের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন। এর জবাবে আল্লাহ তাঁকে একটি ধৈর্যশীল সন্তানের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। বক্তব্যের অন্তরনিহিত অর্থ পরিষ্কার একথা জানিয়ে দিচ্ছে যে, এ দোয়া ঠিক তখন করা হয়েছিল যখন তিনি ছিলেন সন্তানহীন। আর যে সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল সেটি ছিল তাঁর প্রথম সন্তান। তারপর কুরআনের বক্তব্যের ধারাবাহিক বর্ণনা থেকে একথাও প্রকাশ হয় যে, সে শিশুটিই যখন পিতার সাথে দৌড় ঝাঁপ করার যোগ্য হয়ে গেলো তখন তাকে যবেহ করার ইশারা করা হলো। এখন একথা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত যে, হযরত ইবরাহীমের (আ) প্রথম সন্তান ছিলেন হযরত ইসমাঈল। হযরত ইসহাক প্রথম সন্তান ছিলেন না, কুরআনে হযরত ইবরাহীমের সন্তানদের ধারাবাহিকতার বর্ণনা এভাবে দেয়া হয়েছে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لِىْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ (ابراهيم : ٣٩)

দুই ঃ কুরআন মজীদে যেখানে হযরত ইসহাকের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে সেখানে তাঁর জন্য "গোলামুন আলীমুন" (জ্ঞানবান বালক) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে ঃ فَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيْمٍ (الزاريات : ٢٨) এবং لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيْمٍ (الحجر : ٥٣) কিন্তু এখানে যে সন্তানটির সুসংবাদ দেয়া হয়েছে তার জন্য "গোলামুন হালীমুন" (ধৈর্যশীল বালক) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয়, দুই পুত্রের দু'টি পৃথক বৈশিষ্ট

ছিল এবং যবেহ করার হুকুমটি জ্ঞানবান সন্তানের জন্য ছিল না, ছিল ধৈর্যশীল সন্তানের জন্য।

তিন ঃ কুরআন মজীদে হযরত ইসহাকের সুসংবাদ দেবার সাথে সাথেই এ সুসংবাদও দেয়া হয়েছিল যে, তাঁর গৃহে ইয়াকূবের মতো পুত্র সন্তান জন্ম নেবে ঃ

فَبَشَّرْنَاهَا بِاِسْحٰقَ وَمِنْ وَّرَاءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ (هود : ٧١)

এখন একথা পরিষ্কার যে, সন্তান জন্মের খবর দেবার সাথে সাথেই তার ওখানে একটি সুযোগ্য পুত্রসন্তানের জন্মেরও খবর দেয়া হয়ে গিয়ে থাকে, তার ব্যাপারে যদি হযরত ইবরাহীমকে এ স্বপ্ন দেখানো হয় যে, তিনি তাকে যবেহ করছেন, তাহলে হযরত ইবরাহীম কখনো একথা বুঝতে পারতেন না যে, তাঁর এ পুত্রকে কুরবানী করে দেবার ইংগিত করা হচ্ছে। আল্লামা ইবনে জারীর এ যুক্তিটির জবাবে বলেন, সম্ভবত এ স্বপ্নটি হযরত ইবরাহীমকে এমন এক সময় দেখানো হয় যখন হযরত ইসহাকের গৃহে হযরত ইয়াকুবের জন্ম হয়ে গেছে। কিন্তু আসলে এটি ঐ যুক্তির একটি অত্যন্ত দুর্বল জবাব। কুরআন মজীদের শব্দ হচ্ছে ঃ "যখন ছেলেটি বাপের সাথে দৌড় ঝাঁপ করার যোগ্য হয়ে গেলো" ঠিক এ সময়ই এ স্বপ্নটি দেখানো হয়েছিল। যে ব্যক্তি মুক্ত মনে এ শব্দগুলো পড়বে তার সামনে ভেসে উঠবে আট দশ বছরের একটি ছেলের ছবি। কোন জোয়ান ব্যক্তি যিনি সন্তানের পিতা তাঁর সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে বলে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না।

চার ঃ কুরআনে আল্লাহ সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করার পর শেষে বলছেন, "আমি তাকে ইসহাকের সুসংবাদ দিয়েছি, সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে একজন নবী।" এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, যে পুত্রকে যবেহ করার ইংগিত দেয়া হয়েছিল, এটি সে পুত্র নয়। বরং পূর্বে অন্য কোন পুত্রের সুসংবাদ দেয়া হয়। তারপর যখন সে পিতার সাথে দৌড়াদৌড়ি ও চলাফেরা করার যোগ্যতা অর্জন করে তখনই তাকে যবেহ করার হুকুম হয়। তারপর যখন হযরত ইবরাহীম এ পরীক্ষায় সফলকাম হয়ে যান তখন তাঁকে আর এক সন্তান অর্থাৎ ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্মের সুসংবাদ দেয়া হয়। ঘটনার এ বিন্যাস চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দান করে যে, যে পুত্রটিকে যবেহ করার হুকুম হয়েছিল তিনি হযরত ইসহাক ছিলেন না। বরং তাঁর কয়েক বছর আগে সে পুত্রের জন্ম হয়েছিল। আল্লামা ইবনে জারীর এ সুস্পষ্ট যুক্তিটি এ বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, প্রথমে কেবলমাত্র হযরত ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল, তারপর যখন তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য কুরবানী করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন তখন তাঁর নবী হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হলো। কিন্তু এটি তাঁর প্রথম জবাবটি থেকেও দুর্বলতর। সত্যই যদি ব্যাপার এটাই হতো, তাহলে আল্লাহ এভাবে বলতেন না ঃ "আমি তাকে ইসহাকের সুসংবাদ দেই, সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে একজন নবী।" বরং তিনি বলতেন, আমি তাকে এ সুসংবাদ দেই যে, তোমার এ পুত্র একজন নবী হবেন সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে।

পাঁচ ঃ নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে প্রমাণিত যে, হযরত ইসমাঈলের বিনিময়ে যে ভেড়াটি যবেহ করা হয়েছিল তার শিং কা'বাঘরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের (রা) যামানা পর্যন্ত সংরক্ষিত ছিল। পরবর্তীতে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ যখন হরম শরীফে ইবনে যুবাইরকে (রা) অবরোধ করে এবং কা'বাঘর ভেঙে ফেলে তখন এ শিংও নষ্ট হয়ে যায়।

ইবনে আব্বাস ও আমের শা'বী উভয়ই এ মর্মে সাক্ষ দেন যে, তারা নিজেরা কা'বাঘরে এ শিং দেখেছিলেন (ইবনে কাসীর) এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরবানীর এ ঘটনা সিরিয়ায় নয়, মক্কা মু'আয্‌যমায় সংঘটিত হয়েছিল এবং হযরত ইসমাঈলের সাথেই ঘটেছিল। তাইতো হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈলের নির্মিত কা'বাঘরে তার স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল।

ছয় ঃ শত শত বছর থেকে আরবীয় বর্ণনাসমূহে ও কিংবদন্তীতে একথা সংরক্ষিত ছিল যে, কুরবানীর এ ঘটনা ঘটেছিল মিনায়। আর এটা শুধুমাত্র কিংবদন্তীই ছিল না বরং সে সময় থেকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানা পর্যন্ত হজ্জের কর্মকাণ্ডের মধ্যে এ কাজটিও নিয়মিতভাবে শামিল হয়ে আসছিল যে, এ মিনা নামক স্থানে যেখানে হযরত ইবরাহীম কুরবানী করেছিলেন প্রত্যেক ব্যক্তি সেখানে গিয়ে পশু কুরবানী করতো। তারপর যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন হলো তখন তিনিও এ পদ্ধতি অব্যাহত রাখেন। এমন কি আজো হজ্জের সময় যিলহজ্জের দশ তারিখে মিনায় কুরবানী করা হয়। সাড়ে চার হাজার বছরের এ অবিচ্ছিন্ন কার্যক্রম একথার অনস্বীকার্য প্রমাণ পেশ করে যে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের এ কুরবানীর উত্তরাধিকারী ছিল বনী ইসমাঈল, বনী ইসহাক নয়। হযরত ইসহাকের বংশে এ ধরনের কোন রেওয়াজ কোন দিন জারি থাকেনি, যাতে সমস্ত জাতি একসাথে কুরবানী করতো এবং তাকে হযরত ইবরাহীমের কুরবানীর স্মৃতি বলা হতো।

এগুলো এমন ধরনের যুক্তি যেগুলো সামনে রাখার পর একথা বিস্ময়কর মনে হচ্ছে যে, স্বয়ং উম্মতে মুসলিমার মধ্যে হযরত ইসহাকের আল্লাহর জন্য কুরবানী হবার ধারণা কেমন করে বিস্তার লাভ করলো। ইহুদীরা যদি হযরত ইসমাঈলকে এ মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে তাদের দাদা হযরত ইসহাকের সাথে একে সংশ্লিষ্ট করার চেষ্টা করে, তাহলে এটি একটি বোধগম্য বিষয় হয় কিন্তু মুসলমানদের একটি বিরাট দল তাদের এ প্রতারণা গ্রহণ করলো কেমন করে? এ প্রশ্নের অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী জবাব দিয়েছেন আল্লামা ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে। তিনি বলেন ঃ

"প্রকৃত ব্যাপার তো আল্লাহই জানেন। তবে বাহ্যত মনে হয়, এ সমস্ত উক্তি (হযরত ইসহাকের আল্লাহর জন্য কুরবানী হবার পক্ষে যেগুলো বলা হয়েছে) কা'ব আহবার থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি যখন হযরত উমরের (রা) আমলে মুসলমান হন তখন মাঝে মধ্যে ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রাচীন কিতাবসমূহের বাণী তাঁদেরকে পড়ে শুনাতেন এবং হযরত উমর (রা) সেসব শুনতেন। এ কারণে অন্য লোকেরাও তাঁর কথা শুনতে শুরু করে এবং তিনি যেসব ভালো–মন্দ বর্ণনা করতেন সেগুলো তারা বর্ণনা করতে শুরু করে। অথচ এ উম্মতের জন্য তাঁর এ তথ্য সম্ভারের মধ্য থেকে কোন জিনিসেরই প্রয়োজন ছিল না।"

মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব কুরাযীর একটি রেওয়ায়াত এ প্রশ্নটির ওপর আরো কিছুটা অলোকপাত করে। তিনি বর্ণনা করেন, একবার আমার উপস্থিতিতে হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের (র) সামনে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, আল্লাহর জন্যে যবেহ করা হয়েছিল কাকে, হযরত ইসহাককে না হযরত ইসমাঈলকে? সে সময় এমন এক ব্যক্তিও মজলিসে হাজির ছিলেন যিনি পূর্বে ইহুদী আলেমদের অন্তরভুক্ত ছিলেন এবং পরে সাচ্চা দিলে মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি বলেন, "হে আমীরুল মু'মেনীন! আল্লাহর কসম, তিনি

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿١١٤﴾ وَنَجَّيْنٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿١١٥﴾ وَنَصَرْنٰهُمْ فَكَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿١١٦﴾ وَاٰتَيْنٰهُمَا الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ ﴿١١٧﴾ وَهَدَيْنٰهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿١١٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِى الْاٰخِرِيْنَ ﴿١١٩﴾ سَلٰمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿١٢٠﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢١﴾ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٢٢﴾

*৪ রুকূ'*

*আমি অনুগ্রহ করেছি মূসা ও হারূনের প্রতি। তাদের উভয়কে ও তাদের জাতিকে উদ্ধার করেছি মহাক্লেশ থেকে।[৬৯] তাদেরকে সাহায্য করেছি, যার ফলে তারাই বিজয়ী হয়েছে। তাদের উভয়কে অত্যন্ত সুস্পষ্ট কিতাব দান করেছি। উভয়কে সঠিক পথ দেখিয়েছি এবং পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে তাদের উভয়ের সম্পর্কে সুখ্যাতি অক্ষুণ্ন রেখেছি। মূসা ও হারূনের প্রতি সালাম। সৎকর্মশীলদের আমি অনুরূপ প্রতিদানই দিয়ে থাকি। আসলে তারা আমার মু'মিন বান্দাদের অন্তরভুক্ত ছিল।*

ইসমাঈল ছিলেন। ইহুদীরা একথা জানে কিন্তু আরবদের প্রতি হিংসাবশত তারা দাবী করে যে, হযরত ইসহাককে আল্লাহর জন্য যবেহ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। (ইবনে জারীর) এ দু'টি কথাকে মিলিয়ে দেখলে জানা যায়, আসলে এটা ছিল ইহুদী প্রচারণার প্রভাব এবং মুসলমানদের মধ্যে এ প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। আর মুসলমানরা যেহেতু তাত্বিক বিষয়ে সবসময় বিদ্বেষ ও স্বার্থপ্রীতি মুক্ত থেকেছে তাই তাদের অনেকেই প্রাচীন সহীফাগুলোর বরাত দিয়ে ঐতিহাসিক বর্ণনার ছদ্মাবরণে ইহুদীরা যেসব বর্ণনা পেশ করতো সেগুলোকে নিছক একটি তাত্বিক সত্য মনে করে গ্রহণ করে নেয় এবং একথা চিন্তা করেনি যে, এর মধ্যে তত্বের পরিবর্তে বিদ্বেষ ও স্বার্থপ্রীতি সক্রিয় রয়েছে।

৬৮. যে উদ্দেশ্যে হযরত ইবরাহীমের কুরবানীর কাহিনী এখানে বর্ণনা করা হয়েছে এ বাক্যটি তার সমগ্র অবয়বের ওপর আলোকপাত করে। হযরত ইবরাহীমের দুই পুত্রের বংশ থেকে দু'টি সুবিশাল জাতির সৃষ্টি হয়। একটি বনী ইসরাঈল জাতি। তাদের মধ্যে জন্ম হয় দুনিয়ার দু'টি বড় ধর্মমত (ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদ)। তারা পৃথিবীর অনেক বড় ও বিস্তৃত অংশকে নিজেদের অনুসারী করে। দ্বিতীয়টি বনী ইসমাঈল জাতি। কুরআন নাযিলের সময় তারা ছিল সমগ্র আরববাসীর নেতা ও অনুসরণযোগ্য। সে সময় মক্কা মু'আয্‌যমার কুরাইশ গোত্র তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদার অধিকারী ছিল। ইবরাহীমী বংশধারার এ দু'টি শাখা যে উন্নতি, বিস্তৃতি ও খ্যাতি অর্জন করে তা সম্ভব হয় হযরত

وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿١٢٥﴾ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٢٦﴾ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٢٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٢٩﴾

*আর ইলিয়াসও অবশ্যই রসূলদের একজন ছিল।[৭০] স্মরণ করো যখন সে তার জাতিকে বলেছিল, "তোমরা ভয় করো না? তোমরা কি বা'আলকে[৭১] ডাকো এবং পরিত্যাগ করো শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহকে, যিনি তোমাদের ও তোমাদের আগের পেছনের বাপ-দাদাদের রব?" কিন্তু তারা তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো কাজেই এখন নিশ্চিতভাবেই তাদেরকে শাস্তির জন্য পেশ করা হবে, তবে আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দারা ছাড়া।[৭২] আর ইলিয়াসের সম্পর্কে সুখ্যাতি আমি পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে অব্যাহত রেখেছি।[৭৩]*

ইবরাহীম ও তাঁর দুই মহান মর্যাদা সম্পন্ন পুত্রের সাথে তাদের রক্ত সম্পর্কের কারণে। নয়তো দেখা যায়, দুনিয়ায় এমন কত শত পরিবারের উদ্ভব হয়েছে এবং কালক্রমে অপরিচিতির গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এখন মহান আল্লাহ এ পরিবারের ইতিহাসের সবচেয়ে স্বর্ণোজ্জ্বল কর্মকাণ্ড বর্ণনা করার পর এ উভয় দলকে এ অনুভূতি দান করছেন যে, তোমরা দুনিয়ায় যা কিছু মর্যাদা লাভ করেছো, এসবের মূলে রয়েছে তোমাদের বাপ-দাদা ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক আলাইহিমুস সালাম প্রতিষ্ঠিত আল্লাহর আনুগত্য, নিঃস্বার্থ আন্তরিকতা ও আল্লাহর হুকুমের জন্য উৎসর্গিত প্রাণের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য। তিনি তাদেরকে বলেন, আমি তাদেরকে যে বরকত ও সমৃদ্ধি দান করেছিলাম এবং নিজের দয়া ও অনুগ্রহের যে বারিধারা তাদের প্রতি বর্ষণ করেছিলাম তা চোখ বন্ধ করে বর্ষণ করিনি। আমি এমনি সহসাই কোন কারণ ছাড়াই এক ব্যক্তি ও তাঁর দুই পুত্রকে বাছাই করে তাদের প্রতি অনুগ্রহ ও দাক্ষিণ্যের ঝরণাধারা প্রবাহিত করিনি। বরং তাঁরা নিজেদের প্রকৃত মালিক ও প্রভুর প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার কিছু প্রমাণ পেশ করেছিলেন এবং তারই ভিত্তিতে এসব অনুগ্রহের হকদার হয়েছিলেন। এখন তোমরা নিছক তাদের আওলাদ এ অহংকারের ভিত্তিতে সেসব অনুগ্রহ ও নিয়ামতের হকদার হতে পারো না। আমি তো অবশ্যই দেখবো, তোমাদের মধ্যে কে সৎকর্মশীল এবং কে জালেম ও পাপাচারী। তারপর যে যেমনটি হবে তার সাথে ঠিক তেমনি ধরনেরই ব্যবহার করা হবে।

৬৯. অর্থাৎ ফেরাউন ও তার জাতি তাদেরকে যে ভয়াবহ বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল তা থেকে।

৭০. হযরত ইলিয়াস আলাইহিস সালাম বনী ইসরাঈলের নবীদের অন্তরভুক্ত ছিলেন। কুরআন মজীদে মাত্র দু'জায়গায় তাঁর আলোচনা এসেছে। এ জায়গায় এবং সূরা আল আন'আমের ৮৫ আয়াতে। আধুনিক গবেষকগণ খৃষ্টপূর্ব ৮৭৫ থেকে ৮৫০ এর মধ্যবর্তী সময়টাকে তাঁর সময় হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি ছিলেন জিল'আদ-এর অধিবাসী (প্রাচীন যুগে জিল'আদ বলা হতো বর্তমান জর্দান রাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চলীয় জিলাগুলোর সমন্বয়ে গঠিত ইয়ারমুক নদীর দক্ষিণে অবস্থিত এলাকাকে)। বাইবেলে তাঁকে এলিয় তিশ্‌বী (Elijah the Tishbite) নামে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী নিচে দেয়া হলো :

হযরত সুলাইমান আলাইহিস্ সালামের ইন্তেকালের পরে তাঁর পুত্র রহব'আম (Rehoboam)-এর অযোগ্যতার ফলে বনী ইসরাঈল রাজ্য দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একভাগে ছিল বাইতুল মাকদিস ও দক্ষিণ ফিলিস্তীন। এটি ছিল দাউদের পরিবারের অধিকারভুক্ত। আর উত্তর ফিলিস্তীন সমন্বয়ে গঠিত দ্বিতীয় ভাগটিতে ইসরাঈল নামে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। পরে সামেরীয়া তার কেন্দ্রীয় স্থান হিসেবে গণ্য হয়। যদিও উভয় রাষ্ট্রের অবস্থাই ছিল দোদুল্যমান কিন্তু ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রথম থেকেই এমন মারাত্মক বিকৃতির পথে এগিয়ে চলছিল যার ফলে তার মধ্যে শিরক, মূর্তিপূজা, জুলুম, নিপীড়ন, ফাসেকী ও চরিত্রহীনতা বেড়ে চলছিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত যখন ইসরাঈলের বাদশাহ আখিয়াব (Ahab) সাইদা (বর্তমান লেবানন)-এর রাজকন্যা ইজবেলকে বিয়ে করে তখন এ বিকৃতি ও বিপর্যয় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এ মুশরিক রাজকন্যার সংস্পর্শে এসে আখিয়াব নিজেও মুশরিক হয়ে যায়। সে সামেরীয়ায় বা'আল-এর মন্দির ও যজ্ঞবেদী নির্মাণ করে। এক আল্লাহর ইবাদাতের পরিবর্তে বা'আলের পূজার প্রচলন করার পূর্ণ প্রচেষ্টা চালায় এবং ইসরাঈলের শহরগুলোতে প্রকাশ্যে বা'আলের নামে বলিদানের প্রচলন করে।

এহেন সময় হযরত ইলিয়াস আলাইহিস সালাম অকস্মাত জনসমক্ষে হাজির হন। তিনি জালআদ থেকে এসে আখিয়াবকে এ মর্মে নোটিস দেন যে, তোমার পাপের কারণে এখন ইসরাঈল রাজ্যে এক বিন্দুও বৃষ্টি হবে না, এমনকি কুয়াসা ও শিশিরও পড়বে না। আল্লাহর নবীর এ উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হলো এবং সাড়ে তিন বছর পর্যন্ত বৃষ্টি একদম বন্ধ থাকলো। শেষ পর্যন্ত আখিয়াবের হুঁশ হলো। সে হযরত ইলিয়াসের সন্ধান করে তাঁকে ডেকে পাঠালো। তিনি বৃষ্টির জন্য দোয়া করার আগে ইসরাঈলের অধিবাসীদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলামীন ও বা'আলের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে ভালোভাবে জানিয়ে দেয়া প্রয়োজন মনে করলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি হুকুম দিলেন, একটি সাধারণ সমাবেশে বা'আলের পূজারীও এসে তার উপাস্য দেবতার নামে বলিদান করবে এবং আমিও আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নামে কুরবানী করবো। দু'টি কুরবানীর মধ্য থেকে মানুষের হাতে লাগানো আগুন ছাড়াই অদৃশ্য আগুন দ্বারা যেটিই ভস্মীভূত হবে তার উপাস্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়ে যাবে। আখিয়াব একথা মেনে নিল। ফলে কারমাল (Carmel) পর্বতে বা'আলের সাড়ে আটশো পূজারী একত্র হলো। ইসরাঈলীদের সাধারণ সমাবেশে তাদের সাথে হযরত ইলিয়াস আলাইহিস সালামের মোকাবিলা হলো। এ মোকাবিলায় বা'আল পূজকরা পরাজিত হলো। হযরত ইলিয়াস সবার সামনে একথা প্রমাণ

করে দিলেন যে, বা'আল একটি মিথ্যা খোদা এবং আসল খোদা হচ্ছেন সেই এক ও একক খোদা যাঁর পক্ষ থেকে তিনি নবী নিযুক্ত হয়ে এসেছেন। এরপর হযরত ইলিয়াস সেই জনসমাবেশে বা'আলের পূজারীদের হত্যা করান এবং তারপর বৃষ্টির জন্য দোয়া করেন। তাঁর দোয়া সংগে সংগেই কবুল হয়ে যায় এবং সমগ্র ইসরাঈল রাজ্যে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়।

কিন্তু এসব মু'জিযা দেখেও স্ত্রৈণ আখিয়াব তার মূর্তিপূজক স্ত্রীর গোলামী থেকে বের হয়ে আসেনি। তার স্ত্রী ইজবেল হযরত ইলিয়াসের দুশমন হয়ে গেলো এবং সে কসম খেয়ে বসলো, যেভাবে বা'আলের পূজারীদের হত্যা করা হয়েছে ঠিক অনুরূপভাবেই হযরত ইলিয়াস আলাইহিস সালামকেও হত্যা করা হবে। এ অবস্থায় হযরত ইলিয়াসকে দেশত্যাগ করতে হলো। কয়েক বছর তিনি সিনাই পাহাড়ের পাদদেশে আশ্রয় নিলেন। এ সময় তিনি আল্লাহর কাছে যে ফরিয়াদ করেছিলেন বাইবেল তাকে এভাবে উদ্ধৃত করছে ঃ

"আমি বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভূর পক্ষে অতিশয় উদ্যোগী হইয়াছি ; কেননা ইস্রায়েল সন্তানগণ তোমার নিয়ম ত্যাগ করিয়াছে, তোমার যজ্ঞবেদি সকল উৎপাটন করিয়াছে ও তোমার ভাববাদিগণকে খড়্গ দ্বারা বধ করিয়াছে ; আর আমি, কেবল একা আমিই অবশিষ্ট রহিলাম, আর তাহারা আমার প্রাণ লইতে চেষ্টা করিতেছে।"

[১—রাজাবলি ১৯ ঃ ১০]

এ সময়ই বায়তুল মাকদিসের ইহুদী শাসক ইয়াহুরাম (Jehoram) ইসরাঈলের বাদশাহ্ আখিয়াবের মেয়েকে বিয়ে করলো এবং ইতিপূর্বে ইসরাঈলে যেসব বিকৃতি বিস্তার লাভ করেছিল এ মুশরিক শাহজাদীর প্রভাবে ইয়াহুদিয়া রাষ্ট্রেও তা ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। হযরত ইলিয়াস এখানেও নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করলেন এবং ইয়াহুরামকে একটি পত্র লিখলেন। বাইবেলে এ পত্র এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

"তোমার পিতা দায়ুদের ঈশ্বর সদাপ্রভূ এইভাবে এই কথা কহেন, তুমি আপন পিতা যিহোশাফটের পথে ও যিহূদা–রাজ আসার পথে গমন কর নাই; কিন্তু ইস্রায়েলের রাজাদের পথে গমন করিয়াছ এবং আহাব–কূলের ক্রিয়ানুসারে যিহূদাকে ও যিরূশালেম নিবাসীদিগকে ব্যভিচার করাইয়াছ; আরও তোমা হইতে উত্তম যে তোমার পিতৃকুলজাত ভ্রাতৃগণ, তাহাদিগকে বধ করিয়াছ ; এই কারণ দেখ, সদাপ্রভূ তোমার প্রজাদিগকে, তোমার সন্তানদিগকে, তোমার ভার্য্যাদিগকে ও তোমার সমস্ত সম্পত্তি মহা আঘাতে আহত করিবেন। আর তুমি অন্ত্রের পীড়ায় অতিশয় পীড়িত হইবে, শেষে সেই পীড়ায় তোমার অন্ত্র দিন দিন বাহির হইয়া পড়িবে।" [২—রাজাবলি ২১ ঃ ১২—১৫]

এ পত্রে হযরত ইলিয়াস যা কিছু বলেছিলেন তা পূর্ণ হলো। প্রথমে ইয়াহুরামের রাজ্য বহিরাগত আক্রমণকারীদের দ্বারা বিধ্বস্ত হলো এবং তার স্ত্রীদেরকে পর্যন্ত শত্রুরা পাকড়াও করে নিয়ে গেলো। তারপর সে নিজে অন্ত্ররোগে মারা গেলো। কয়েক বছর পর হযরত ইলিয়াস আবার ইসরাঈলে পৌঁছে গেলেন। তিনি আখিয়াব ও তার পুত্র আখ্যিয়াহকে সত্য সঠিক পথে আনার জন্য লাগাতার প্রচেষ্টা চালালেন। কিন্তু সামেরীয়ার রাজ পরিবারে যে পাপ একবার জেঁকে বসেছিল তা আর কোনভাবেই বের হলো না। শেষে

হযরত ইলিয়াসের বদ্দোয়ায় আখিয়াবের পরিবার ধ্বংস হয়ে গেলো এবং তারপর আল্লাহ তাঁর নবীকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিলেন। এ ঘটনাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য বাইবেলের নিম্নোক্ত অধ্যায়গুলো দেখুন ঃ [১—রাজাবলি, অধ্যায় ১৭, ১৮, ১৯, ২১; ২—রাজাবলি অধ্যায় ১ ও ২ এবং ২—বংশাবলি, অধ্যায় ২১]

৭১. বা'আল-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে প্রভু, সরদার ও মালিক। স্বামীর প্রতিশব্দ হিসেবেও এ শব্দটি বলা হতো এবং কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এ শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন সূরা বাকারার ২২৮, সূরা নিসার ১২৭, সূরা হূদের ৭২ এবং সূরা নূরের ৩১ আয়াতসমূহ। কিন্তু প্রাচীন যুগে সিরিয়ার বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী এ শব্দটিকে উপাস্য ও প্রভু অর্থে ব্যবহার করতো এবং তারা একটি বিশেষ দেবতাকে বা'আল নামে চিহ্নিত করে রেখেছিল। বিশেষ করে লেবাননের ফনিকি সম্প্রদায়ের (Phoenicians) সবচেয়ে বড় পুরুষ দেবতা ছিল বা'আল এবং তার স্ত্রী আশারাত (Ashtoreth) ছিল তাদের সবচেয়ে বড় দেবী। বা'আল বলতে সূর্য বা বৃহস্পতি গ্রহ বুঝায় এবং আশারাত বলতে চাঁদ বা শুক্রগ্রহ বুঝায় এ ব্যাপারে গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। যাই হোক না কেন একথা ঐতিহাসিক দিক দিয়ে প্রমাণিত যে, ব্যবিলন থেকে নিয়ে মিসর পর্যন্ত সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য এলাকায় বা'আল পূজা বিস্তার লাভ করেছিল। বিশেষ করে লেবানন, সিরিয়া ও ফিলিস্তীনের মুশরিক জাতিগুলো আপাদমস্তক এর মধ্যে ডুবে ছিল। বনী ইসরাঈল যখন মিসর থেকে বের হবার পর ফিলিস্তীন ও পূর্ব জর্দানে এসে বসবাস শুরু করলো এবং তাওরাতের কঠোর নিষেধাজ্ঞাগুলোর বিরুদ্ধাচরণ করে তারা ঐ মুশরিক জাতিগুলোর সাথে বিয়ে-শাদী ও সামাজিক সম্পর্ক কায়েম করতে শুরু করলো তখন তাদের মধ্যেও এ রোগ বিস্তার লাভ করতে লাগলো। বাইবেলের বর্ণনা মতে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের প্রথম খলিফা হযরত ইউশা' বিন নূনের ইন্তেকালের পরপরই বনী ইসরাঈলের মধ্যে এ নৈতিক ও ধর্মীয় অবক্ষয়ের সূচনা হয়ে গিয়েছিল ঃ

> "ইস্রায়েল-সন্তানগণ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই করিতে লাগিল; এবং বাল দেবগণের সেবা করিতে লাগিল।...........তাহারা সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়া বাল দেবের ও অষ্টারেৎ দেবীদের সেবা করিত।" [বিচারকর্তৃগণ ২ ঃ ১১—১৩]

> "ফলে ইস্রায়েল-সন্তানগণ কনানীয়, হিত্তীয়, ইমোরীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়গণের মধ্যে বসতি করিল ; আর তাহারা তাহাদের কন্যাগণকে বিবাহ করিত, তাহাদের পুত্রগণের সহিত আপন আপন কন্যাদের বিবাহ দিত ও তাহাদের দেবগণের সেবা করিত।" [বিচারকর্তৃগণ ৩ ঃ ৫—৬]

সে সময় ইসরাঈলীদের মধ্যে বা'আল পূজার এত বেশী প্রচলন হয়ে পড়েছিল যে, বাইবেলের বর্ণনা মতে তাদের একটি জনপদে প্রকাশ্যে বা'আলের যজ্ঞবেদী নির্মিত হয়েছিল এবং সেখানে বলিদান করা হতো। আল্লাহর অনুগত জনৈক ইসরাঈলী এটা বরদাশ্ত করতে পারলো না। সে রাতের বেলা চুপিচুপি যজ্ঞবেদীটি ভেঙে ফেললো। পরদিন জনতার একটি বিরাট সমাবেশ অনুষ্ঠিত হলো। তারা শির্কের এ আড্ডাখানা উচ্ছেদকারী ব্যক্তির হত্যার দাবী করতে লাগলো। (বিচারকর্তৃগণ ৬ ঃ ২৫—৩২) শেষ পর্যন্ত এ অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটালেন হযরত সামুয়েল, তালূত এবং হযরত দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিমুস সালাম। তাঁরা কেবল বনী ইসরাঈলেরই সংস্কার করলেন না, নিজেদের রাজ্যেও

سَلَٰمٌ عَلَىٰٓ إِلْ يَاسِينَ ۝١٣٠ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ۝١٣١ إِنَّهُۥ مِنْ
عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ۝١٣٢ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۝١٣٣ إِذْ نَجَّيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ
أَجْمَعِينَ ۝١٣٤ إِلَّا عَجُوزًا فِى ٱلْغَٰبِرِينَ ۝١٣٥ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْءَاخَرِينَ ۝١٣٦ وَإِنَّكُمْ
لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ۝١٣٧ وَبِٱلَّيْلِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝١٣٨

*ইলিয়াসের প্রতি সালাম।[৭৪] সৎকর্মশীলদের আমি অনুরূপ প্রতিদানই দিয়ে থাকি। যথার্থই সে আমার মু'মিন বান্দাদের একজন ছিল।*

*আর লূতও তাদের একজন ছিল যাদেরকে রসূল বানিয়ে পাঠানো হয়। স্মরণ করো যখন আমি তাকে এবং তার পরিবারের সকলকে উদ্ধার করি, এক বুড়ি ছাড়া যে পেছনে অবস্থানকারীদের অন্তরভুক্ত ছিল।[৭৫] তারপর বাকি সবাইকে ধ্বংস করে দেই। এখন তোমরা দিনরাত তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকা অতিক্রম করে যাও।[৭৬] তোমরা কি বোঝ না?*

শিরক ও মূর্তিপূজা নির্মূল করলেন। কিন্তু হযরত সুলাইমানের মৃত্যুর পর এ ফিত্নাটি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো এবং বিশেষ করে উত্তর ফিলিস্তীনের ইসরাঈল রাষ্ট্রটি বা'আল পূজার বন্যার বিপুল স্রোতে ভেসে গেলো।

৭২. অর্থাৎ এ শাস্তির বাইরে একমাত্র তারাই থাকবে যারা হযরত ইলিয়াসের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেনি এবং যাদেরকে আল্লাহ এ জাতির মধ্য থেকে তাঁর বন্দেগীর জন্য বাছাই করে নিয়েছিলেন।

৭৩. বনী ইসরাঈল হযরত ইলিয়াসকে তাঁর জীবদ্দশায় যেভাবে নির্যাতিত করেছিল তার কাহিনী ওপরে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু পরে তারা তাঁর এমনই ভক্তে–অনুরক্তে পরিণত হয় যে, হযরত মূসার (আ) পরে অতি অল্প লোককেই তারা তাঁর চেয়ে মহিমান্বিত বলে মেনে নিয়ে থাকবে। তাদের সেখানে একথা ছড়িয়ে পড়ে যে, হযরত ইলিয়াস আলাইহিস সালামকে একটি ঘূর্ণিঝড়ের মাধ্যমে জীবিত অবস্থায় আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয় (২—রাজাবলি, ২ অধ্যায়) এবং তিনি আবার দুনিয়ায় আসবেন। বাইবেলের মালাখি পুস্তকে বলা হয়েছে ঃ

> "দেখ, সদাপ্রভূর সেই মহৎ ও ভয়ঙ্কর দিন আসিবার পূর্বে আমি তোমাদের নিকট এলিয় ভাববাদীকে প্রেরণ করিব।" (৪ ঃ ৫)

হযরত ইয়াহইয়া ও ঈসা আলাইহিমাস সালামের আগমনকালে ইহুদিরা সাধারণত তিনজন আগমনকারীর প্রতীক্ষারত ছিল। তাদের একজন হচ্ছেন হযরত ইলিয়াস (আ) ও দ্বিতীয়জন হযরত ঈসা মসীহ (আ) এবং তৃতীয়জন হচ্ছেন "এ নবী" (অর্থাৎ মুহাম্মাদ

وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٣٩﴾ اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿١٤٠﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ ﴿١٤١﴾ فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ ﴿١٤٢﴾ فَلَوْلَآ اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ﴿١٤٣﴾ لَلَبِثَ فِيْ بَطْنِهٖٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٤٤﴾

*৫ রুকূ'*

*আর অবশ্যই ইউনুস রসূলদের একজন ছিল।[৭৭] স্মরণ করো যখন সে একটি বোঝাই নৌকার দিকে পালিয়ে গেলো,[৭৮] তারপর লটারীতে অংশগ্রহণ করলো এবং তাতে হেরে গেলো। শেষ পর্যন্ত মাছ তাকে গিলে ফেললো এবং সে ছিল ধিকৃত।[৭৯] এখন যদি সে তাস্‌বীহকারীদের অন্তরভুক্ত না হতো,[৮০] তাহলে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত এ মাছের পেটে থাকতো।[৮১]*

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। যখন হযরত ইয়াহইয়ার (আ) নবুওয়াত শুরু হয় এবং তিনি লোকদেরকে সত্যধর্মে দীক্ষিত করতে থাকেন তখন ইহুদীদের ধর্মীয় নেতারা তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি মসীহ? তিনি জবাব দেন, না। আবার জিজ্ঞেস করে, আপনি কি ইলিয়াহ? তিনি জবাব দেন, না। তারপর জিজ্ঞেস করে, আপনি কি "সেই নবী"? তিনি জবাব দেন, আমি সেই নবীও নই। তখন তারা বলে, আপনি যদি মসীহ না হন; ইলিয়াহ না হন এবং সেই নবী না হন, তাহলে আপনি সত্যধর্মে দীক্ষা দিচ্ছেন কেন? (যোহন ১ ঃ ১৯—২৬) তারপর কিছুকাল পরে যখন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের তৎপরতা ব্যাপকতা লাভ করলো তখন ইহুদীরা মনে করলো, সম্ভবত ইলিয়াহ নবী এসে গেছেন। (মার্ক ৬ ঃ ১৪—১৫) হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সাহাবীদের মধ্যে এ ধারণা বিস্তার লাভ করেছিল যে, ইলিয়াহ নবীর আগমন ঘটবে। কিন্তু হযরত ঈসা (আ) একথা বলে তাদের ভুল ধারণা দূর করে দেন যে, "ইলিয়াহ তো এসে গেছেন, লোকেরা তাঁকে চিনেনি এবং তাঁর সাথে যা ইচ্ছা ব্যবহার করেছে।" এর ফলে হযরত ঈসার (আ) সাহাবীগণ জানতে পারেন, আগমনকারী ছিলেন হযরত ইয়াহইয়া, আটশো বছর পূর্বে অতিক্রান্ত হযরত ইলিয়াস নন।" (মথি ১১ ঃ ১৪ এবং ১৭ ঃ ১০—১৩)

৭৪. মূল শব্দগুলো হচ্ছে سَلَامٌ عَلٰى اِلْ يَاسِيْنَ এ সম্পর্কে কোন কোন মুফাস্‌সির বলেন, এটি হযরত ইলিয়াসের দ্বিতীয় নাম। যেমন হযরত ইব্‌রাহীমের দ্বিতীয় নাম ছিল আব্রাহাম। আর অন্য কোন কোন মুফাস্‌সিরের মতে আরববাসীদের মধ্যে ইব্‌রানী (হিব্রু) ভাষার শব্দাবলীর বিভিন্ন উচ্চারণের প্রচলন ছিল। যেমন মীকাল ও মীকাইল এবং মীকাইন একই ফেরেশতাকে বলা হতো। একই ঘটনা ঘটেছে হযরত ইলিয়াসের নামের ব্যাপারেও। স্বয়ং কুরআন মজীদে একই পাহাড়কে একবার "তূরে সাইনা" বলা হচ্ছে এবং অন্যত্র বলা হচ্ছে, "তূরে সীনীন।"

৭৫. এখানে হযরত লূতের (আ) স্ত্রীর কথা বলা হয়েছে, যে হিজরাতের হুকুম আসার পর তার মহান স্বামীর সাথে যায়নি বরং নিজের সম্প্রদায়ের সাথে থাকে এবং আযাবে নিক্ষিপ্ত হয়।

৭৬. এ বিষয়ের দিকে ইংগিত করা হয়েছে যে, কুরাইশ ব্যবসায়ীরা সিরিয়া ও ফিলিস্তীন যাবার পথে লূতের সম্প্রদায়ের বিধ্বস্ত জনপদ যেখানে অবস্থিত ছিল দিনরাত সে এলাকা অতিক্রম করতো।

৭৭. কুরআন মজীদে এ তৃতীয়বার হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের বিষয় আলোচিত হয়েছে। এর আগে সূরা ইউনুস ও সূরা আম্বিয়ায় তাঁর আলোচনা এসেছে এবং আমি তার ব্যাখ্যা করেছি। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা ইউনুস, ৯৮—১০০ টীকা এবং সূরা আল আম্বিয়া, ৮২—৮৫ টীকা)

৭৮. মূলে ابق শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এ শব্দটি কেবলমাত্র তখনই ব্যবহার করা হয় যখন গোলাম তার প্রভুর কাছ থেকে পালিয়ে যায়। الاباق هرب العبد من سيده অর্থাৎ "ইবাক অর্থ হচ্ছে প্রভুর কাছ থেকে গোলামের পালিয়ে যাওয়া।" (লিসানুল আরব)

৭৯. এ বাক্যগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে ঘটনার যে চিত্রটি সামনে ভেসে ওঠে তা হচ্ছে ঃ

এক ঃ হযরত ইউনুস যে নৌকায় আরোহণ করেছিলেন তা তার ধারণ ক্ষমতার চাইতে বেশী বোঝাই (Overloaded) ছিল।

দুই ঃ নৌকায় লটারী অনুষ্ঠিত হয় এবং সম্ভবত এমন সময় হয় যখন সামুদ্রিক সফরের মাঝখানে মনে করা হয় যে, নৌকা তার ধারণ ক্ষমতার বেশী বোঝা বহন করার কারণে সকল যাত্রীর জীবন বিপদের মুখোমুখি হয়ে পড়েছে। কাজেই লটারীতে যার নাম উঠবে তাকেই পানিতে নিক্ষেপ করা হবে, এ উদ্দেশ্যে লটারী করা হয়।

তিন ঃ লটারীতে হযরত ইউনুসের নামই ওঠে। তাঁকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয় এবং একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলে।

চার ঃ হযরত ইউনুসের এ পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হবার কারণ হচ্ছে এই যে, তিনি নিজে প্রভুর (অর্থাৎ মহান আল্লাহ) অনুমতি ছাড়াই তাঁর কর্মস্থল থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। "আবাকা" শব্দটি এ অর্থই প্রকাশ করছে, ওপরের ৭৮ টীকায় এ ব্যাখ্যাই করা হয়েছে। "মুলীম" শব্দটিও একথাই বলছে। মুলীম এমন অপরাধীকে বলা হয় যে নিজের অপরাধের কারণে নিজেই নিন্দিত হবার হকদার হয়ে গেছে, তাকে নিন্দা করা হোক বা না হোক।

(يقال قد الام الرجل اذا اتى مايلام عليه من الامر وان لم يلم – ابن جرير)

৮০. এর দু'টি অর্থ হয় এবং দু'টি অর্থই এখানে প্রযোজ্য। একটি অর্থ হচ্ছে, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম পূর্বেই আল্লাহ থেকে গাফিল লোকদের অন্তরভুক্ত ছিলেন না বরং তিনি তাদের অন্তরভুক্ত ছিলেন যারা ছিলেন আল্লাহর চিরন্তন প্রশংসা, মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণাকারী। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, যখন তিনি মাছের পেটে পৌছুলেন তখন আল্লাহরই

فَنَبَذْنٰهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ ﴿١٤٥﴾ وَاَنْۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ ﴿١٤٦﴾
وَاَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ ﴿١٤٧﴾ فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ﴿١٤٨﴾

*শেষ পর্যন্ত আমি তাকে বড়ই রুগ্ন অবস্থায় একটি তৃণলতাহীণ বিরান প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম[৮২] এবং তার ওপর একটি লতানো গাছ উৎপন্ন করলাম।[৮৩] এরপর আমি তাকে এক লাখ বা এরচেয়ে বেশী লোকদের কাছে পাঠালাম।[৮৪] তারা ঈমান আনলো এবং আমি একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত তাদেরকে টিকিয়ে রাখলাম।[৮৫]*

দিকে রুজূ' করলেন এবং তারই প্রশংসা, মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকলেন। সূরা আল আম্বিয়ায় বলা হয়েছে ঃ

فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

"তাই সে অন্ধকারের মধ্যে তিনি ডেকে উঠলেন, তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, পাক-পবিত্র তোমার সত্তা, অবশ্যই আমি অপরাধী।"

৮১. এর অর্থ এ নয় যে, এ মাছটি কিয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকতো এবং হযরত ইউনুস (আ) কিয়ামত পর্যন্ত তার পেটে বেঁচে থাকতেন। বরং এর অর্থ হচ্ছে, কিয়ামত পর্যন্ত এ মাছের পেটই তাঁর কবরে পরিণত হতো। প্রখ্যাত মুফাস্সিরগণ এ আয়াতটির এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

৮২. অর্থাৎ হযরত ইউনুস (আ) যখন তাঁর অপরাধ স্বীকার করে নিলেন এবং একজন মু'মিন ও ধৈর্যশীল বান্দার ন্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা গাইতে লাগলেন তখন আল্লাহর হুকুমে মাছ তাঁকে উপকূলে উদ্‌গীরণ করলো। উপকূল ছিল একটি বিরাণ প্রান্তর। সেখানে সবুজের কোন চিহ্ন ছিল না এবং এমন কোন জিনিসও ছিল না যা হযরত ইউনুসকে ছায়াদান করতে পারে। সেখানে খাদ্যেরও কোন সংস্থান ছিল না।

এখানে এসে অনেক বুদ্ধি ও যুক্তিবাদের দাবীদারকে একথা বলতে শুনা গেছে যে, মাছের পেটে ঢুকে যাবার পর কোন মানুষের জীবিত বের হয়ে আসা অসম্ভব। কিন্তু বিগত শতকের শেষের দিকে এ তথাকথিত বুদ্ধিবাদ ও যুক্তিবাদীতার কেন্দ্র ভূমির (ইংল্যাণ্ড) উপকূলের সন্নিকটে একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। এ ঘটনাটি তাদের দাবী খণ্ডন করে। "১৮৯১ সালের আগষ্ট মাসে Star of the East নামক জাহাজে চড়ে কয়েকজন মৎস্য শিকারী তিমি শিকারের উদ্দেশ্যে গভীর সমুদ্রে যায়। সেখানে তারা ২০ ফুট লম্বা, ৫ ফুট চওড়া ও ১০০ টন ওজনের একটি বিশাল মাছকে আহত করে। কিন্তু তার সাথে লড়াই করার সময় জেম্‌স বার্টলে নামক একজন মৎস শিকারীকে তার সাথীদের চোখের সামনেই মাছটি গিলে ফেলে। একদিন পরে জাহাজের লোকেরা মাছটিকে মৃত অবস্থায় পায়। বহুকষ্টে সেটিকে তারা জাহাজে ওঠায় এবং তারপর দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর তার পেট কাটলে জেম্‌স তার মধ্য থেকে জীবিত বের হয়ে আসে। এ ব্যক্তি মাছের পেটে পুরা ৬০ ঘন্টা থাকে।" (উর্দূ ডাইজেষ্ট, ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪) চিন্তার ব্যাপার হচ্ছে, সাধারণ অবস্থায়

প্রাকৃতিকভাবে যদি এমনটি হওয়া সম্ভবপর হয়ে থাকে, তাহলে অস্বাভাবিক অবস্থায় আল্লাহর মু'জিযা হিসেবে এমনটি হওয়া কেমন করে অসম্ভব হতে পারে?

৮৩. মূলে বলা হয়েছে شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِيْنٍ ইয়াকতীন আরবী ভাষায় এমন ধরনের গাছকে বলা হয় যা কোন গুঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে না বরং লতার মতো ছড়িয়ে যেতে থাকে। যেমন লাউ, তরমুজ, শশা ইত্যাদি। মোটকথা সেখানে অলৌকিকভাবে এমন একটি লতানো গাছ উৎপন্ন করা হয়েছিল যার পাতাগুলো হযরত ইউনুসকে ছায়া দিচ্ছিল এবং ফলগুলো একই সংগে তাঁর জন্য খাদ্য সরবরাহ করছিল এবং পানিরও যোগান দিচ্ছিল।

৮৪. "এক লাখ বা এর বেশী" বলার মানে এ নয় যে, এর সঠিক সংখ্যার ব্যাপারে আল্লাহর সন্দেহ ছিল। বরং এর অর্থ হচ্ছে, যদি কেউ তাদের জনবসতি দেখতো তাহলে সে এ ধারণাই করতো যে, এ শহরের জনসংখ্যা এক লাখের বেশীই হবে, কম হবে না। সম্ভবত হযরত ইউনুস যে শহরটি ত্যাগ করে পালিয়ে গিয়েছিলেন এটি সেই শহরই হবে। তাঁর চলে যাবার পর সে শহরের লোকেরা আযাব আসতে দেখে যে ঈমান এনেছিল তার অবস্থা ছিল এমন তাওবার মতো যা কবুল করে নিয়ে তাদের ওপর থেকে আযাব হটিয়ে দেয়া হয়েছিল। এখন হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে পুনরবার তাদের কাছে পাঠানো হলো, যাতে তারা নবীর প্রতি ঈমান এনে যথারীতি মুসলমান হয়ে যায়। এ বিষয়টি বুঝার জন্য সূরা ইউনুসের ৯৮ আয়াতটি সামনে থাকা দরকার।

৮৫. হযরত ইউনুসের (আ) এ ঘটনা সম্পর্কে আমি সূরা ইউনুস ও সূরা আম্বিয়ার ব্যাখ্যায় যা কিছু লিখেছি সে সম্পর্কে কেউ কেউ আপত্তি উঠিয়েছেন। তাই সংগতভাবেই এখানে অন্যান্য মুফাস্সিরগণের উক্তিও উদ্ধৃত করছি ঃ

বিখ্যাত মুফাস্সির কাতাদা সূরা ইউনুসের ৯৮ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ "এমন কোন জনপদ দেখা যায়নি যার অধিবাসীরা কুফরী করেছে এবং আযাব এসে যাবার পরে ঈমান এনেছে আর তারপর তাদেরকে রেহাই দেয়া হয়েছে। একমাত্র ইউনুসের সম্প্রদায় এর ব্যতিক্রম। তারা যখন তাদের নবীর সন্ধান করে তাঁকে না পেয়ে অনুভব করলো আযাব নিকটে এসে গেছে তখন আল্লাহ তাদের মনে তাওবার প্রেরণা সৃষ্টি করলেন।" (ইবনে কাসীর, ২ খণ্ড, ৪৩৩ পৃষ্ঠা)

একই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আলূসী লিখছেন, এ জাতির কাহিনী হচ্ছে ঃ "হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম মসুল এলাকায় নিনেভাবাসীদের কাছে আগমন করেছিলেন। তারা ছিল কাফের ও মুশরিক। হযরত ইউনুস তাদেরকে এক ও লা-শরীক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার ও মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করার আহবান জানান। তারা তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে। হযরত ইউনুস তাদেরকে জানিয়ে দেন, তৃতীয় দিন আযাব আসবে এবং তৃতীয় দিন আসার আগেই অর্ধ রাতে তিনি জনপদ থেকে বের হয়ে পড়েন। তারপর দিনের বেলা যখন এ জাতির মাথার ওপর আযাব পৌঁছে যায়.........এবং তাদের বিশ্বাস জন্মে যে, তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে তখন তারা নিজেদের নবীকে খুঁজতে থাকে কিন্তু তাঁকে খুঁজে পায় না। শেষ পর্যন্ত তারা সবাই নিজেদের ছেলেমেয়ে, পরিবার-পরিজন ও গবাদি পশু নিয়ে খোলা প্রান্তরে বের হয়ে আসে

এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে ও তাওবা করে। ..........আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা করেন এবং তাদের দোয়া কবুল করেন।" (রূহুল মা'আনী, ১১ খণ্ড, ১৭০ পৃষ্ঠা)

সূরা আম্বিয়ার ৮৭ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আলূসী লিখেছেন : "হযরত ইউনুসের নিজের জাতির প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বের হয়ে যাওয়া ছিল হিজরাতের কাজ। কিন্তু তাঁকে এর হুকুম দেয়া হয়নি।" (রূহুল মা'আনী, ১৭ খণ্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা) তারপর তিনি হযরত ইউনুসের দোয়ার বাক্যাংশ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ এর অর্থ বর্ণনা করেছেন এভাবে : "অর্থাৎ আমি অপরাধী ছিলাম। নবীদের নিয়মের বাইরে গিয়ে হুকুম আসার আগেই হিজরাত করার ব্যাপারে আমি তাড়াহুড়া করেছিলাম। হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের পক্ষ থেকে এটি ছিল তাঁর নিজের গোনাহের স্বীকৃতি এবং তাওবার প্রকাশ, যাতে আল্লাহ তাঁকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন।" (রূহুল মা'আনী, ১৭ খণ্ড, ৭৮ পৃষ্ঠা)

এ আয়াতটির টীকায় মওলানা আশরাফ আলী থানবী লিখেছেন : "তাঁর নিজের জাতি তাঁর প্রতি ঈমান না আনায় তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে যান এবং জাতির ওপর থেকে আযাব হটে যাবার পরও নিজে তাদের কাছে ফিরে আসেননি। আর এ সফরের জন্য আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষাও করেননি।" (বায়ানুল কুরআন)

এ আয়াতের টীকায় মওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী লিখেছেন : "জাতির কার্যকলাপে ক্ষিপ্ত হয়ে ক্রুদ্ধচিত্তে শহর থেকে বের হয়ে যান। আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা করেননি এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান যে, তিন দিনের মধ্যে তোমাদের ওপর আযাব নেমে আসবে।.......... إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ বলে নিজের অপরাধ স্বীকার করেন এ মর্মে যে, অবশ্যই আমি তাড়াহুড়া করেছি, তোমার হুকুমের অপেক্ষা না করেই জনপদের অধিবাসীদের ত্যাগ করে বের হয়ে পড়ি।"

সূরা সা-ফ্ফা-তের ওপরে উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাযী লিখেছেন : হযরত ইউনুসের অপরাধ ছিল, তাঁর যে জাতি তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল আল্লাহ তাকে ধ্বংস করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, এ আযাব নির্ঘাত এসে যাবে। তাই তিনি সবর করেননি। জাতিকে দাওয়াত দেবার কাজ বাদ দিয়ে বাইরে বের হয়ে গিয়েছিলেন। অথচ দাওয়াতের কাজ সবসময় জারী রাখাই ছিল তাঁর দায়িত্ব। কারণ আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস না করার সম্ভাবনা তখনো ছিল।" (তাফসীরে কবীর, ৭ খণ্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা)

আল্লামা আলূসী إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ সম্পর্কে লিখেছেনঃ "আবাকা-এর আসল মানে হচ্ছে, প্রভুর কাছ থেকে দাসের পালিয়ে যাওয়া। যেহেতু হযরত ইউনুস তাঁর রবের অনুমতি ছাড়াই নিজের জাতির কাছ থেকে পলায়ন করেছিলেন তাই তাঁর জন্য এ শব্দটির ব্যবহার সঠিক হয়েছে। "তারপর সামনের দিকে তিনি আরো লিখেছেন : "তৃতীয় দিনে হযরত ইউনুস আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই বের হয়ে গেলেন। এখন তাঁর জাতি তাঁকে না পেয়ে তাদের বড়দের, ছোটদের ও গবাদি পশুগুলো নিয়ে বের হয়ে পড়লো। আযাব অবতীর্ণ হবার বিষয়টি তাদের কাছে এসে পৌঁছেছিল। তারা আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করলো এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলো। আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিলেন।" (রূহুল মা'আনী, ২৩ খণ্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা)

فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُوْنَ ﴿١٤٩﴾ اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَّهُمْ شٰهِدُوْنَ ﴿١٥٠﴾ اَلَآ اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ ﴿١٥١﴾ وَلَدَ اللّٰهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٥٢﴾ اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ﴿١٥٣﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿١٥٤﴾ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٥٥﴾ اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥٦﴾ فَاْتُوْا بِكِتٰبِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٥٧﴾

*তারপর তাদেরকে একটু জিজ্ঞেস করো,*[৮৬] *(তোমাদের মন কি একথায় সায় দেয় যে,) তোমাদের রবের জন্য তো হচ্ছে কন্যারা এবং তাদের জন্য পুত্ররা?*[৮৭] *সত্যই কি আমি ফেরেশ্তাদেরকে মেয়ে হিসেবে সৃষ্টি করেছি এবং তারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে একথা বলছে? ভালো করেই শুনে রাখো, আসলে তারা তো মনগড়া কথা বলে যে, আল্লাহর সন্তান আছে এবং যথার্থই তারা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ কি নিজের জন্য পুত্রের পরিবর্তে কন্যা পছন্দ করেছেন? তোমাদের কি হয়ে গেছে, কিভাবে ফায়সালা করছো? তোমরা কি সচেতন হবে না? অথবা তোমাদের কাছে তোমাদের এসব কথার সপক্ষে কোন পরিষ্কার প্রমাণপত্র আছে? তাহলে আনো তোমাদের সে কিতাব, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।*[৮৮]

মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী وَهُوَ مُلِيْمٌ –এর ব্যাখ্যা প্রসংগে লিখেছেন ঃ "অভিযোগ এটিই ছিল যে, ইজতিহাদী ভুলের দরুন আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা না করে জনপদ থেকে বের হয়ে পড়েন এবং আযাবের দিন নির্ধারণ করে দেন।"

আবার সূরা আল কলম–এর

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ

আয়াতের টীকায় মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী লিখেছেন ঃ "অর্থাৎ মাছের পেটে প্রবেশকারী পয়গম্বরের (হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম) মতো মিথ্যা আরোপকারীদের ব্যাপারে সংকীর্ণমনতা ও ভীতি–আশংকার প্রকাশ ঘটাবে না।" তারপর একই আয়াতের وَهُوَ مَكْظُوْمٌ বাক্যাংশের টীকায় তিনি লিখেছেন ঃ "অর্থাৎ জাতির বিরুদ্ধে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। বিরক্ত হয়ে দ্রুত আযাবের জন্য দোয়া এবং ভবিষ্যদ্বাণী করে বসলেন।"

মুফাস্সিরগণের এসব বর্ণনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনটি ভুলের কারণে হযরত ইউনুসের (আ) ওপর অসন্তোষ ও ক্রোধ নেমে আসে। এক, তিনি নিজেই আযাবের

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٨﴾ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٠﴾ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٦١﴾ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ﴿١٦٢﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴿١٦٣﴾ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿١٦٤﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ ﴿١٦٥﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿١٦٦﴾ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿١٦٧﴾ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦٨﴾ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٩﴾

*তারা আল্লাহ ও ফেরেশ্‌তাদের[৮৯] মধ্যে আত্মীয় সম্পর্ক স্থাপন করে রেখেছে। অথচ ফেরেশ্‌তারা ভালো করেই জানে তাদেরকে অপরাধী হিসেবে উপস্থিত করা হবে (এবং তারা বলে,) "আল্লাহ সেসব দোষ থেকে মুক্ত যেগুলো তাঁর একনিষ্ঠ বান্দারা ছাড়া অন্যেরা তাঁর ওপর আরোপ করে। কাজেই তোমরা ও তোমাদের এ উপাস্যরা কাউকে আল্লাহ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারবে না, সে ব্যক্তিকে ছাড়া যে জাহান্নামের প্রজ্জ্বলিত আগুনে প্রবেশকারী হবে।[৯০] আর আমাদের অবস্থা তো হচ্ছে এই যে, আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের একটি স্থান নির্ধারিত রয়েছে[৯১] এবং আমরা সারিবদ্ধ খাদেম ও তাসবীহ পাঠকারী।"*

*তারা তো আগে বলে বেড়াতো, হায়! পূর্ববর্তী জাতিরা যে "যিকির" লাভ করেছিল তা যদি আমাদের কাছে থাকতো তাহলে আমরা হতাম আল্লাহর নির্বাচিত বান্দা।[৯২]*

দিন নির্দিষ্ট করে দেন। অথচ আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ধরনের কোন ঘোষণা হয়নি। দুই, সেদিন আসার আগেই হিজরাত করে দেশ থেকে বের হয়ে যান। অথচ আল্লাহর হুকুম না আসা পর্যন্ত নবীর নিজ স্থান ত্যাগ করা উচিত নয়। তিন, সে জাতির ওপর থেকে আযাব হটে যাওয়ার পর তিনি নিজে তাদের মধ্যে ফিরে যাননি।

৮৬. এখান থেকে আর একটি বিষয় শুরু হচ্ছে। প্রথম বিষয়টি ১১ আয়াত থেকে শুরু হয়েছিল। অর্থাৎ মক্কার কাফেরদের সামনে এ প্রশ্ন রাখা হয়েছিল ঃ "তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তাদেরকে সৃষ্টি করা বেশী কঠিন কাজ, না আমি যেগুলো সৃষ্টি করে রেখেছি সেগুলো?" এখন তাদেরই সামনে এ দ্বিতীয় প্রশ্ন আনা হচ্ছে। প্রথম প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল কাফেরদেরকে তাদের এ ভ্রষ্টতা সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া যে, তারা মৃত্যু পরের জীবন ও শাস্তি–পুরস্কারকে অসম্ভব মনে করতো এবং এ জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামকে বিদ্রূপ করতো। এখন এ দ্বিতীয় প্রশ্নটি তাদের এ মূর্খতা সম্পর্কে সতর্ক করে দেবার জন্য পেশ করা হচ্ছে যে, তারা বলতো আল্লাহর সন্তান আছে এবং অনুমানের ঘোড়া দাবড়িয়ে যাকে ইচ্ছা তাকেই আল্লাহর সন্তান বলে আখ্যায়িত করতো।

৮৭. হাদীস থেকে জানা যায়, আরবের কুরাইশ, জুহাইনিয়া, বনী সালেমাহ, খুযা'আহ, বনী মূলাহ এবং অন্যান্য গোত্র বিশ্বাস করতো, ফেরেশ্তারা আল্লাহর কন্যা। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে তাদের এ জাহেলী আকীদার কথা বলা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দেখুন সূরা আন নিসা, ১১৭; আন নাহ্ল, ৫৭—৫৮; বনী ইসরাঈল, ৪০; আয্ যুখরুফ, ১৬—১৯ এবং আন নাজ্ম, ২১—২৭ আয়াতসমূহ।

৮৮. অর্থাৎ ফেরেশ্তাদেরকে আল্লাহর কন্যা মনে করার জন্য দু'টি বুনিয়াদই হতে পারে। এ ধরনের কথা তারা বলতে পারে প্রত্যক্ষ দর্শনের ভিত্তিতে অথবা এ ধরনের দাবী যারা করে তাদের কাছে আল্লাহর এমন কোন কিতাব থাকতে হবে যাতে আল্লাহ নিজেই ফেরেশ্তাদেরকে নিজের কন্যা বলে উল্লেখ করে থাকবেন। এখন এ বিশ্বাসের প্রবক্তারা যদি কোন প্রত্যক্ষ দর্শনের দাবী করতে না পারে এবং এমন কোন কিতাবও তাদের কাছে না থাকে, যাতে একথা বলা হয়েছে, তাহলে নিছক উড়ো কথার ভিত্তিতে একটি দীনী বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করে নেয়া এবং বিশ্ব–জাহানের মালিকের সাথে সুস্পষ্ট হাস্যকর কথা সম্পৃক্ত করে দেয়ার চাইতে বড় মূর্খতা ও বোকামি আর কী হতে পারে।

৮৯. মূলে 'মালাইকা'র (ফেরেশ্তাবৃন্দ) পরিবর্তে 'আল জিন্নাহ' (الجنة) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু কোন কোন শ্রেষ্ঠ তাফসীরকারের মতে এখানে 'জিন' শব্দটি তার আভিধানিক অর্থের (অর্থাৎ গুপ্ত সৃষ্টি) প্রেক্ষিতে 'মালাইকা' তথা ফেরেশ্তা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ ফেরেশ্তাও আসলে একটি গোপন জীবই। পরবর্তী বিষয়বস্তু এখানে জিন শব্দটি ফেরেশ্তা অর্থে ব্যবহার করারই দাবী জানায়।

৯০. এ আয়াতের দ্বিতীয় অনুবাদ এও হতে পারে ঃ "কাজেই তোমরা ও তোমাদের এ ইবাদাত, এর ভিত্তিতে তোমরা কাউকে ফিত্নার মধ্যে নিক্ষেপ করতে পারো না কিন্তু একমাত্র তাকে যে............।" এ দ্বিতীয় অনুবাদের প্রেক্ষিতে এর অর্থ হবে, হে পথভ্রষ্টের দল! এই যে, তোমরা আমাদের পূজা করছো এবং আমাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সন্তান গণ্য করছো, এর মাধ্যমে তোমরা আমাদেরকে ফিতনার মধ্যে নিক্ষেপ করতে পারো না। এর মাধ্যমে তো কেবলমাত্র এমন নির্বোধই ফিত্নার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হতে পারে, যে সর্বনাশের শেষ সীমায় পৌছে গেছে। অন্য কথায় বলা যায়, ফেরেশ্তারা তাদেরকে বলছে ঃ "পাতো এ ফাঁদ অন্য পাখির জন্য।"

৯১. অর্থাৎ আল্লাহর সন্তান হওয়া তো দূরের কথা, আমাদের অবস্থা তো হচ্ছে এই যে, আমাদের মধ্যে যার জন্য যে মর্যাদা ও স্থান নির্ধারিত হয়েছে তা থেকে সামান্যতমও এদিক ওদিক করার ক্ষমতা কারো নেই।

৯২. একই বিষয়বস্তু সূরা ফাতিরের ৪২ আয়াতে আলোচিত হয়েছে।

فَكَفَرُوا بِهٖ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٧٠﴾ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٧١﴾
اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ ﴿١٧٢﴾ وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿١٧٣﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ
حَتّٰى حِيْنٍ ﴿١٧٤﴾ وَّاَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧٥﴾ اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿١٧٦﴾
فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿١٧٧﴾ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى
حِيْنٍ ﴿١٧٨﴾ وَّاَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧٩﴾ سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا
يَصِفُوْنَ ﴿١٨٠﴾ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٨١﴾ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨٢﴾

*কিন্তু (যখন সে এসে গেছে) তখন তারা তাকে অস্বীকার করেছে। এখন শিগ্‌গির তারা (তাদের এ নীতির ফল) জানতে পারবে। আমার প্রেরিত বান্দাদেরকে আমি আগেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করা হবে এবং আমার সেনাদলই বিজয়ী হবে।[৯৩] কাজেই হে নবী! কিছু সময় পর্যন্ত তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও এবং দেখতে থাকো, শীঘ্রই তারা নিজেরাও দেখে নেবে।[৯৪] তারা কি আমার আযাবের জন্য তাড়াহুড়া করছে? যখন তা নেমে আসবে তাদের আঙিনায়, সেদিনটি হবে যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের জন্য বড়ই অশুভ। ব্যস, তাদেরকে কিছুকালের জন্য ছেড়ে দাও এবং দেখতে থাকো, শিগ্‌গির তারা নিজেরাও দেখে নেবে।*

*তারা যেসব কথা তৈরি করছে তা থেকে পাক-পবিত্র তোমার রব, তিনি মর্যাদার অধিকারী। আর সালাম প্রেরিতদের প্রতি এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলামীনেরই জন্য।*

৯৩. আল্লাহর সেনাদল বলতে এমন ঈমানদারদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা আল্লাহর রসূলের আনুগত্য করে এবং তাঁর সহযোগী হয়। তাছাড়া এমন অদৃশ্য শক্তিও এর অন্তরভুক্ত হয় যাদের সাহায্যে মহান আল্লাহ সত্যপন্থীদেরকে সাহায্য-সহায়তা দান করে থাকেন।

এ সাহায্য ও বিজয়ের অর্থ অবশ্যই এ নয় যে, প্রত্যেক যুগে আল্লাহর প্রত্যেক নবী এবং তাঁর প্রত্যেক অনুসারী দল রাজনৈতিক বিজয়ই লাভ করবেন। বরং এ বিজয় বহু ধরনের হবে। রাজনৈতিক বিজয়ও এর মধ্যে একটি। যেখানে আল্লাহর নবীগণ এ ধরনের প্রাধান্য লাভ করেননি সেখানেও তাঁদের নৈতিক প্রাধান্য প্রমাণিত হয়েই থাকবে। যেসব

জাতি তাদের কথা মানেনি এবং তাদের দেয়া হিদায়াতের বিরোধী পথ অবলম্বন করেছে তারা শেষ পর্যন্ত বরবাদই হয়ে গেছে। মূর্খতা ও ভ্রষ্টতার যে দর্শনই মানুষ তৈরি করেছে এবং যে বিকৃত জীবনাচরণই জোরপূর্বক প্রচলন করা হয়েছে তা সবই কিছুদিন পর্যন্ত টিকে থাকার পর শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছে। কিন্তু হাজার হাজার বছর থেকে আল্লাহর নবীগণ যে সত্যগুলোকে প্রকৃত সত্য হিসেবে পেশ করে এসেছেন তা আগেও ছিল অপরিবর্তনীয় এবং আজো অপরিবর্তিত রয়েছে। কেউ তাকে স্বস্থান থেকে নড়াতে পারেনি।

৯৪. অর্থাৎ বেশীদিন যেতে না যেতেই তারা নিজেদের পরাজয় ও তোমার বিজয় স্বচক্ষে দেখে নেবে। একথা যেভাবে বলা হয়েছিল ঠিক সেভাবেই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এ আয়াতগুলো নাযিল হবার পর বড়জোড় ১৪/১৫ বছর অতিক্রান্ত হয়ে থাকবে মক্কার কাফেররা নিজেদের চোখেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর নিজের শহরে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ দেখে নিয়েছে এবং তারপর এর কিছুকাল পরেই তারা দেখে নিয়েছে, ইসলাম কেবলমাত্র আরবের ওপরেই নয় বরং বিশাল পারশ্য ও রোমান সাম্রাজ্যের ওপরও বিজয়ী হয়েছে।

---